বসন্তকুমারের পত্র।

উপন্যাস।

—০০০—

শ্রীনটেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

৭৫ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট, বাঙ্গালা যন্ত্রে

শ্রীহরিচরণ আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮২।
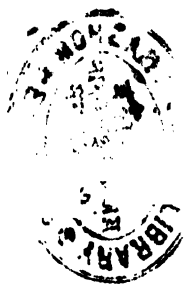
বসন্তকুমারের পত্র।

(উপন্যাস।)

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র।

সোদর-প্রতিম হরকুমার !

অদ্য পূর্ণিমা। আকাশে পূর্ণশশী মধুহাসি হাসিতেছে। নীলাকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডল হইতে শান্ত রশ্মি আকাশতল শান্ত করিতে করিতে নিম্নে আসিয়া নদীবক্ষে, পর্ব্বতে, পথে, ঘাটে, মাঠে, পুষ্করিণীর জলে রজত-ছটায় প্রতিফলিত হইয়াছে। চারিদিকে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সকলেই বিমল চন্দ্রকিরণস্নাত হইয়া আমোদ করিতেছে। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—কিন্তু যাহাদের সুখ ফুরাইয়াছে, বা সুখের আশা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় এই জ্যোৎস্নাময়ী

রজনীতেও ঘনান্ধতমোময়। তুমি জান, আমি জ্যোৎস্না-ময়ী রজনীর পক্ষপাতী—চাঁদের আলো আমি বড় ভাল বাসি; কিন্তু চন্দ্রালোকে এ হৃদয় আর উজ্জ্বল হইবে না। বুঝি, কিছুতেই আর এ হৃদয় উজ্জ্বল হইবে না। আমার এই বিংশতিবর্ষ বয়স হইল, এই বয়সেই বুঝি আমার সকল ফুরায়!—ফুরায় কেন? ফুরাই-য়াছে। আমার জীবনের এই সুখ-স্বপ্ন—এই মধুর খেলা কিসে ফুরাইল শুনিবে? হরকুমার! এ সংসারে যদি কেহ আমার সুহৃদ্ থাকে, তবে সে তুমি। তোমাকে এ সকল হৃদয়ের কথা না বলিলে আর কাহাকে বলিব! সুরোদ্যানের পারিজাত, হীরককুলের কহিনুর, রাজ-কুলের রামচন্দ্র, বন্ধুকুলের তুমি। তোমাকে ভিন্ন এ হৃদয়-দাহক শোকপাবক আর কাহাকে দেখাই? স্মৃতি ক্ষেত্রের বহুদূর পর্য্যটন করিয়া দেখ, আমাদের প্রতিবাসীকন্যা কুসুমিকাকে মনে পড়ে কি? না, আমাদিগের গ্রাম ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া সকলই ভুলিয়াছ? যদি মনে না পড়িয়া থাকে ত বলি যে কুসুমিকা, মৃত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। তুমি তাহাকে নিতান্ত বালিকা দেখিয়াছ; এক্ষণে সে বড় হইয়াছে, লিখিতে পড়িতেও শিখিয়াছে। আমি তাহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছি। আমার দুইটি ছাত্রী—

কুসুমিকা ও আমাদের প্রতিবাসী বিনোদবিহারী চট্টো-পাধ্যায়ের কন্যা নীলাব্জিকা। ইহাদের দুই জনকেই তুমি দেখিয়াছ,—কিন্তু তাহার পর বহুদিবস গিয়াছে। কুসুমিকা এক্ষণে আর বালিকা নহে, সে এক্ষণে কিশোর-বয়স্কা। কুসুমিকা সুন্দরী,—তাহার সৌন্দর্য্য অতি পবিত্র ও সরলতাময়। সে সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, কিন্তু বুঝান যায় না। কুসুম আমাকে বাল্যাবধি ভালবাসে। ক্রমে সেই ভালবাসা বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হৃদয় সেই ভালবাসায় পূর্ণ হইতে লাগিল, জগৎ মধুর দেখিতে লাগিলাম। কুসুমিকা একাদশ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশে পড়িল। তখন কুসুমিকা আর অধিক আমার নিকট আসিত না, আমাকে দেখিলেই মধুরহাসি হাসিয়া পলাইত। কখন কখন আমার অনুপস্থিতে আমার পুস্তকে কালির দাগ কাটিত। কখন কখন দুই এক খানি পুস্তক লুকাইয়া রাখিত। কখন বা পুস্তকে আমার কতক-গুলা নাম লিখিত। আজি এক বৎসর হইল কুসুমিকা আমার নিকট পড়া বন্ধ করিয়াছে—তাহার মাতার আজ্ঞায়। এক্ষণে কুসুমিকার বয়স তের বৎসর। আজি কালি সে প্রায়ই আমার নিকট আসে না। আমাকে দেখিলে কখন কখন দূর হইতে আধ লজ্জায়, আধ

আহ্লাদে ধীর অথচ তীক্ষ্ণ কটাক্ষশর নিক্ষেপ করে। এক্ষণে সেই আয়ত, প্রশান্ত লোচনে কটাক্ষ দেখা দিয়াছে; সে কটাক্ষ তীব্র নয়, মর্ম্মভেদী নয়, কোমল, ধীর অথচ সুতীক্ষ্ণ। কুসুমিকার এক্ষণকার এই সলজ্জভাবটি অতি মধুর। যৌবন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে একটু লজ্জার আবির্ভাব সেটী অতি মনোহর, অতি পবিত্র। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী বসন্তই রমণীয়, যৌবন নিদাঘে সকলই অগ্নিময় করিয়া তুলে। হরকুমার! এই বাসন্তলাবণ্যময়ী কুসুমিকা আমার জীবনের আনন্দ, পৃথিবীর স্বর্গ, ভবিষ্যতের আশা। আমার সেই জীবনের আনন্দ, পৃথিবীর স্বর্গ, ভবিষ্যতের আশা আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। কুসুমিকার মাতা এক সমন্ধ স্থির করিয়া তাহার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিবাহ শীঘ্রই হইবে। আমার সেই বালসঙ্গিনী, জীবনের আনন্দদায়িনী, লাবণ্যময়ী কুসুমিকা পরের হইবে, ইহার চিন্তামাত্রেই আমার হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভূত হয়। হরকুমার! আমার আর পৃথিবীর সুখ ভাল লাগে না। তোমার জীবন সুখপূর্ণ, তুমি সুখ ভোগ কর। পৃথিবী আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে, প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই কে যেন কাঁদে। কি ভাবি, কিছুই স্থির করিতে পারি না।

তুমি, আমার এই দৌর্ব্বল্য দেখিয়া হাসিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি কেবলই দৌর্ব্বল্য, ইহার ভিতর কি আর কিছুই নাই? যাহা হউক, এক্ষণে যে কি কষ্টে দিন কাটিতেছে তাহা তোমাকে আর কি লিখিব। সন্ধ্যা অবধি সকাল পর্য্যন্ত মৃত্যু কামনা করি, আবার সকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিবার জন্য অধীর হই—গ্রহ কদাচিৎ প্রসন্ন হয়—অনেক দিন হইল, কুসুম একটি ফুল দিয়াছিল, সেটি শুকাইয়া গিয়াছে। তাই আর একটি চাহিয়াছিলাম, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া একটি স্ফুটনোন্মুখ গোলাব দিয়াছে। অদ্য তিন দিবস হইল তাহা আমার ফুলদানীতে রহি-য়াছে, পাপ্‌ড়িগুলিন শুকাইয়া গিয়াছে, মুখটি মলিন হইয়াছে; কিন্তু অন্তর তেমনি সুরভি, তেমনি রক্তিম, তেমনি কোমল! তিন দিনের ফুল এত জীবন্ত দেখি নাই! আর অধিক কি লিখিব, তোমার কুশল সংবাদ দিও। ইতি।

৭ই ভাদ্র ১২৭০ সাল।	তোমারই স্নেহাকাঙ্ক্ষী
দেবপুর।	বসন্ত।

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উত্তর।

অভিন্নহৃদয় বসন্ত!

তোমার পত্র পাইয়াছি। যে কীটে তোমার হৃদয় কুরিয়া খাইতেছে তাহাও জানিলাম। তুমি সংসারের প্রেমবহ্নিতে পুড়িয়া মরিবার উপক্রম করিতেছ—ইচ্ছা করিয়া পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় গা ঢালিয়া দিবার আয়োজন করিতেছ। জ্বলন্ত বহ্নিশিখা শুনিয়া তুমি বিস্মিত হইবে, তুমি বলিবে আমার এ পবিত্র প্রেম, বহ্নিশিখা কিসে? ভাই হে! ঘটনাস্রোতে কি যে কি হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কুসুমিকার প্রতি তোমার প্রেম যদি নিঃস্বার্থ হইত, তাহা হইলে তোমার এই প্রেমকে আমি বহ্নিশিখা বলিতাম না, যেখানেই স্বার্থ সেই খানেই বহ্নি। তোমার প্রেম স্বার্থপূর্ণ—তুমি কুসুমিকাকে কেবল ভালবাসিয়াই সুখী নহ। তুমি সেই ভালবাসার প্রতিদানে কিছু আকাঙ্ক্ষা কর। কি আকাঙ্ক্ষা কর? কেবল পবিত্র ভালবাসা? তাহা ত তুমি পাইয়াছ। কুসুমিকা বালিকা বয়সেই তাহার কুসুম-কোমল হৃদয় খানি তোমাকে দিয়াছে—তাহার হৃদয়ে যেটুকু ভালবাসা থাকিতে পারে,

সকলই তোমাকে দিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, তুমি অধিক কিছু চাও, তোমার তৃষা না থাকিলে তুমি কাঁদিবে কেন? তৃষা ত্যাগ কর—আসঙ্গলিপ্সা ত্যাগ কর, হৃদয় শান্ত হইবে। তোমাকে আমি ভাল বাসিতে নিষেধ করিতেছি না—ভাল বাস পুড়িতে হইবে, ভাল বাসিও না ততোধিক পুড়িতে হইবে। কিন্তু তোমার ভালবাসা স্বার্থশূন্য হইলে বহ্নিশিখা তোমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে পারিবে না। তুমি কুসুমিকাকে কেবল ভাল বাসিয়াই সুখী হইতে চেষ্টা কর। তুমি আমার এই সকল কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবে না জানিয়াই এই কতকগুলা লিখিলাম। তুমি ভাবুক, এ সকল কথা তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি কেন, এ সকল কথা কে না জানে? কিন্তু জানিয়া শুনিয়া লোকে দুঃখ পায় কেন? এই সকল জানিয়াও কয়জনে ইহার মত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? ইহাতে আমাদিগের দোষ দিই না, কারণ আমরা দুর্ব্বল ও পতঙ্গস্বভাব। শুদ্ধ উপদেশে—কতকগুলা যুক্তিসিদ্ধ কথায় যদি স্বভাবের গতি ফিরিত, তাহা হইলে সংসারে এত দুঃখ থাকিত না। যাহাহউক, কুসুমিকার মাতা কেন দুইটি নবীনজীবনকে কীটমুখে সমর্পণ করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম

না। তোমাদের পরস্পর ভালবাসা, বোধ হয় তাঁহার অবিদিত নাই। তবে তিনি এ পবিত্রপ্রেমে বাধা দেন কেন? জানিনা সংসারের লোকে কে কিরূপ বুঝে! যাহা হউক ভাই, সংসারে থাকিতে হইলে হৃদয়কে পাষাণ করিতে হইবে। এ সংসার-সমুদ্রে কত শত ঘটনাতরঙ্গ আসিয়া এই জীর্ণহৃদয়ে অহরহ আঘাত করিবে, তাহা কে বলিতে পারে! হৃদয় আঘাত-সহিষ্ণু কর, সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিওনা। আর তুমি লিখিয়াছ, তোমার বাঁচিতে আকাঙ্ক্ষা নাই, বাঁচিতে আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া মরিব কেন? অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের জীবন হইতে সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত কোন না কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সেই উদ্দেশ্য কাহার এবং কি, তাহা আমরা জানি না। কে কোন্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃষ্ট, তাহা না জানিয়াও তাহার জীবনে সে সেই উদ্দেশ্য সমাধা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরাও এখানে যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহাই করিয়া সময়ে চলিয়া যাইব। মৃত্যু কামনা করিও না। তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, চিত্ত সংযত করিতে শিখ নাই। চিত্তসংযম মহা ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের বলে জগতের প্রত্যেক বিঘ্ন বিপত্তি স্বতঃই

তোমার সুখের পথ হইতে অপসৃত হইবে। কুসুমিকার সহিত তোমার বিবাহ হয়, আমার ঐকান্তিক বাসনা; যদি ঘটনাক্রমে না হয়, চিত্ত-সংযমে তুমি সমর্থ হও, জগদীশ্বরের চরণে আমার এই ভিক্ষা।

১২ই ভাদ্র ১২৭০ সাল
বিল্বগ্রাম।

তোমারই
হরকুমার শর্ম্মা

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর।

হরকুমার!

জগদীশ্বরের চরণে তোমার ভিক্ষা পৌঁছিল না—আমার চিত্ত সংযত হইল না। আজি সপ্তাহকাল হইল, কুসুমিকাকে দেখিতে প্রয়াস পাই নাই। ভাবিলাম, যদি আমার সহিত বিবাহ,তাহার মাতার অভিপ্রেত না হয়, তবে তাহাকে আর কেন বৃথা দেখা দিয়া নিজের ও তাহার মন ব্যাকুলিত করি! যাহাকে দেখিলে, চিরকাল দেখিবার বাসনা হয়, তাহাকে যদি চিরকালই দেখিতে

না পাইলাম, তবে কেন ক্ষণিক দেখিয়া এ দুরন্ত তৃষার বৃদ্ধি করি! ভাবিলাম, যদি ঈশ্বরের ইহাই অভিপ্রেত হয় হউক, আমি চিত্ত সংযত করিব। সপ্তাহকাল চিত্ত-সংযম মহাব্রতে ব্রতী রহিলাম। কালি প্রদোষকালে, প্রাসাদোপরি শূন্যমনে বসিয়া আছি। প্রদোষগগনে সান্ধ্য তিমির আসিয়া পড়িল, সান্ধ্যগগনে এক একটী করিয়া নক্ষত্র নীরবে ফুটিতে লাগিল, বাল্যকালে যেমন ফটিত এখনও সেইরূপ ফুটিতে লাগিল; দুই একটা নিশা-চর পক্ষী মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে বহুকালবিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায় বাল্যবৃত্তান্ত আসিয়া স্মৃতিপটে উদয় হইল। সেই সুখপূর্ণ সময়ে যাহাদের সঙ্গে এই প্রাসাদোপরি একত্রে বেড়াইতাম, ক্রমে তাহা-দিগের মূর্ত্তি আসিয়া স্মৃতিপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কুসুমিকা ও নীলাজিকা আসিয়া তাহাদের বাল্যরূপ সম্মুখে ধরিল। বাল্যকালের কত কথা মনে পড়িল— তাহাদের উভয়ের অকৃত্রিম প্রণয়, কুসুমের আমারপ্রতি বাল্যানুরাগ,আরও ত ককথা মনে পড়িল। স্মৃতি কুসুমি-কার সেই বাল্য মূর্ত্তিখানি আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিল, তাহার সেই দিব্য মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকথা আসিয়া হৃদয় ব্যাকুল করিল, চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠিল।

স্মৃতিপটাঙ্কিত ছবি দেখিব না বলিয়া চক্ষু মুদিলাম। এ চক্ষু ত মুদিলাম, কিন্তু মনশ্চক্ষু যে মুদিত হয় না। মন অস্থির হইল। আকাশ প্রতি চাহিলাম—নীল, অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকা নিঃস্তব্ধে ফুটিয়া রহিয়াছে। নীলাকাশে বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল প্রতি অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম— চন্দ্রদেব, পূর্ব্বস্মৃতির সহায় হইলেন—কুসুমিকা সম্বন্ধে কত কথা মনে পড়িল, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতর ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজি এই চন্দ্রালোকবিভাসিত রজনীতে তাহাকে একবার দেখিব, আর দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তাহার মাতার চরণে ধরিয়া আজি সকল কথা বুঝাইব, পরে কুসুমিকাকে না পাই, দেশে দেশে বেড়াইয়া এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করিব। ইহা ভাবিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম—কুসুমের বাটীতে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া বাহির হইলাম। আমার চিত্তসংযম মহাব্রত ভঙ্গ হইল। ভাই হরকুমার! তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে, দুর্ব্বলহৃদয় বলিবে, কি করিব! জগদীশ্বর সকল হৃদয়ে সমান বল দেন নাই। কুসু-

মিকাকে দেখিবার জন্য তাহার ভগ্নপ্রাসাদ-সমীপে উপস্থিত হইলাম। তাহার বাটীর নিকটে যাইবামাত্র প্রাণের ভিতর বিষাদ-সঙ্গীত গীত হইল। কুসুমিকার বাটী পুরাতন, জীর্ণ ও ভগ্ন কিন্তু বহুদূরবিস্তৃত ও বৃহৎ। এই বহুদূরবিস্তৃত, বৃহৎ ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে এক্ষণে কেবল তিনজনমাত্র মনুষ্য বাস করিতেছে। কুসুমিকা, তাহার মাতা ও এক জন বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য। কুসুমের পিতা একজন সমৃদ্ধ লোক ছিলেন। এককালে এই জনহীন ভগ্নাট্টালিকা বহুলোকপূর্ণ সুন্দর রাজভবনের ন্যায় ছিল। কোন অর্থপিশাচ বিশ্বাসঘাতকের চাতুরীতে ইহারা আজি পথের ভিখারী, —এইরূপ জনশ্রুতি। যাহাহউক, সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কুসুমকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাসাদ সমীপে উপস্থিত হইলাম। ভগ্নাট্টালিকা চন্দ্রকর-বিধৌত হইয়া মলিন হাসি হাসিতেছে, মৃদুল সমীরণে বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, প্রাসাদের, ভগ্ন ভিত্তির উপর একটী নবীন বনলতা নব কিশলয় বক্ষে ধরিয়া সমীরণে ঈষম্মাত্র দুলিতেছে—প্রকৃতি নীরব, আমার হৃদয়ও নীরব, নীরব হৃদয়ে নীরব প্রকৃতি বড়ই মধুর লাগিল। প্রাসাদমধ্যে নিঃশব্দপদসঞ্চারে

প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র, প্রাসাদ-প্রাচীরে স্ফুট চন্দ্রালোকে কাহার ছায়া দেখিলাম। কে এই জ্যোৎস্নাধৌত নিশায় প্রাসাদোপরি পাদচারণ করিতেছে? বিশেষ করিয়া ছায়ার প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম, জানিলাম এই ছায়া কাহার! প্রাঙ্গণের যে দিকে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকের সম্মুখের ছাদের আলিসার নিকট কুসুমিকা আসিয়া দাঁড়াইল—ছায়া অন্তর্হিত হইল। চন্দ্রালোকে উভয়ে উভয়কে দেখিলাম। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে কুসুমিকা আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার প্রফুল্ল, আয়ত লোচন-যুগল আমার মুখের প্রতি স্থাপিত করিয়া কি দেখিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে সেই মুখ খানি দেখিয়া বিহ্বল-চিত্ত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "কুসুম! অমন করিয়া শূন্যমনে কি ভাবিতেছ?"

"কি জানি কি ভাবিতেছি! কত কি ভাবিতেছি

"ইহার অর্থ কি? আমাকে এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ?"

"হইয়াছি।"

"সেই জন্যই কি ভাবিতেছ?"

"না।"

"তবে কি, বল—তোমার সুন্দর মুখখানি মলিন দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, বল কি ভাবিতেছ।"

"বলিব—তাহা তোমাকে না বলিলে আমি বাঁচিব না, কিন্তু আগে তুমি বল তুমি আজি এখানে কেন ?"

"আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, আর—"

"আর—কি বল।"

"আর, তোমার বিবাহের পূর্ব্বে তোমার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

কুসুমিকার চক্ষু জলভারস্তম্ভিত হইল, বলিল, "আমার বিবাহ ! কাহার সঙ্গে ? জানি না অদৃষ্টে কি আছে !"

"কুসুম ! কাঁদিও না। বিধাতার মনে যাহা আছে হইবে—কিন্তু তোমার মাতাই আমাকে নবীন জীবনে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করিলেন। জানি না আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে তাঁহার কিসের আপত্তি !"

"বসন্তকুমার ! কি করিলে শীঘ্র মৃত্যু হয় ?"

"তুমি অমন কথা মুখে আনিও না, আশীর্ব্বাদ করি—জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন।"

"আমার আর সুখ কি ? জগতে তুমি ভিন্ন আমার আর সুখ নাই। তোমাকে না দেখিতে পাইলে

প্রাণে মরিব। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে—আমি কাহাকে দেখিয়া বাঁচিব ?”

“কুসুম ! তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে—তুমি অন্যের হইবে ইহার চিন্তা মাত্রেই আমার হৃদয়ে যে কি হয়, তাহা তুমি কি বুঝিবে ? আমি আর এ জ্বালা সহ্য করিতে পারি না, আজি তোমার মাতার চরণে ধরিয়া সকল কথা বুঝাইব, তাঁহার নিকট তোমাকে ভিক্ষা করিয়া লইব ; ভিক্ষা পাই ভাল, না পাই বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের ন্যায় দেশে দেশে ফিরিয়া এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করিব।”

কুসুম কিছুই বলিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বলিল, “বসন্তকুমার ! কতদিন এই চাঁদের আলোয় কত সুখের কথা কহিয়াছি, আজি এ দুঃখ কেন ? আচ্ছা, সে সকল সুখের দিন কোথায় গেল ?”

“যেখানে সকলই গিয়াছে ও যাইবে।”

“সে কোথায় ?”

“অনন্তে—”

“অনন্ত কোথায় ? সেখানে কি যাওয়া যায় না ?”

“কেন, সেখানে যাইবার এত সাধ কেন ?”

"বুঝি যেখানে আমাদের সেই সুখের দিন গিয়াছে সেই খানে যাইলে হৃদয় জুড়াইবে।"

"কুসুম! তোমার অভিপ্রায় যদি তুমি নিজমুখে মাতার নিকট প্রকাশ করিতে না পার, নীলাব্জিকার দ্বারায় তাঁহাকে জানাইলে তিনি সকলই বুঝিতে পারিবেন, আর বোধ হয় তাহা হইলে তিনি অন্য স্থানে তোমার বিবাহের উদ্যোগ করিবেন না। নীলাব্জিকা তোমাকে ভগ্নীর অধিক ভাল বাসে, সে এ বিষয় তোমার মাতাকে আনন্দের সহিত বলিতে পারে।"

"আমি নীলাব্জিকাকে একথা মার নিকট বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আজি বলিব কালি বলিব করিয়া কেন আজিও বলেন নাই,—জানি না।"

"শোন, কুসুম! আজি আমি তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিব। আজি রজনীতে আমার ভাগ্য নিরূপিত হইবে—তাঁহার একটী মাত্র কথার উপর আমার জীবনের প্রায় সমস্তই নির্ভর করিতেছে—" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় ভগ্নসৌধোপরি পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। কুসুমিকার মাতা কুসুমিকাকে ডাকিলেন—তাঁহার স্বর অতি কোমল ও স্নেহব্যঞ্জক। কুসুমিকার মাতা পীড়িতা। আমি কুসুমকে

তাহার মাতার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিলাম যে তাঁহার পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। দিন দিন শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, রোগ চিকিৎসা মানিতেছে না। কুসুমিকা বাষ্পাকুললোচনে, প্রায়াবরুদ্ধ স্বরে আমার হাত ধরিয়া কহিল—“এ জগতে আমার দুঃখিনী মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই।”

‘ভাবিও না, জগদীশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। তুমি এক্ষণে তাঁহার নিকট যাও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।”

কুসুমিকা তাহার মাতার গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র স্নেহময়ী মাতা তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া কহিলেন, “কুসুম! তোমাকে আর দুঃখ দিব না, আজি আমি তোমাদের সকল কথা দূরে থাকিয়া শুনিয়াছি। বসন্তকুমার, তোমাকে যে চিরজীবন ভাল বাসিবেন তাহা আজি আমি জানিয়াছি। আগে জানিতে পারি নাই বলিয়াই তোমার অন্যত্র বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলাম, যেখানে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলাম, সেই খানে আমার এক ছোট ভগ্নী আছেন; তিনি ভিন্ন এক্ষণে আমাদের যথার্থ আত্মীয় আর কেহই নাই। তাঁহার নিকট থাকিলে তুমি মাতৃস্নেহ পাইতে পারিবে ইহারই জন্য

তোমার সেখানে বিবাহ দিব স্থির করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তুমি জন্মাবধি সুখের মুখ দেখ নাই, যাহাতে তুমি সুখী হও আমি তাহাই করিব—বসন্তকুমারের সহিতই তোমার বিবাহ দিব। আমারও কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, এখন তোমার প্রফুল্ল মুখ না দেখিয়া মরিলে আমার মরণেও সুখ হইবে না।” আমি এই সকল কথা গৃহদ্বারের পশ্চাৎ হইতে শুনিলাম। কুসুমিকা মাতার এই শেষোক্ত কথাগুলিন শুনিয়া নীরবে মাতৃপার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। মাতা, কুসুমিকাকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি মুছাইয়া দিলেন। গৃহাভ্যন্তরস্থ দীপালোকে দেখিলাম যে তাঁহারও বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে। দেখিয়া, প্রাণ বড়ই কাতর হইয়া উঠিল; নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলাম। মানবাদৃষ্টে পূর্ণসুখ কোথায়?

২৬শে ভাদ্র }
১২৭০ সাল। } বসন্ত

বসন্তকুমারের দ্বিতীয় পত্র।

সোদরপ্রতিম হরকুমার!

পত্র লিখিবার প্রণালী যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদের কতদূর ধন্যবাদের পাত্র তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। বন্ধু, দূরে থাকিয়া বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছেন; সন্তান, বহুদূরে বিদেশে থাকিয়া বৃদ্ধ জনক জননীকে সংবাদদানে শীতল করিতেছেন; প্রোষিতভর্তৃকা, বহুকাল পরে প্রাণপতির লিপি বক্ষে ধরিয়া তৃষিত হৃদয় তৃপ্ত করিতেছেন; তাহাই বলিতেছি যিনি পত্রলেখা প্রণালী প্রথম উদ্ভূত করেন, তিনি আমাদের পরম প্রীতির পাত্র। হরকুমার! তোমাকে আমার এই সাধারণ, অসার জীবনের কাহিনী জানিয়া রাখিতে হইবে। আমার এই জীবনকাহিনী জানিয়া, তোমার কোন লাভেরই সম্ভাবনা নাই, তবে তোমাকে এই সকল কথা লিখিয়া আমি সুখী হই বলিয়া লিখি, নতুবা আমার জীবনকাহিনী মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা শুনিলে তোমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে! তবে প্রত্যেক মনুষ্য-

জীবনই সুখ দুঃখে আবদ্ধ—জীবনের সেই সকল সুখ দুঃখ যদি অপর কেহ না জানিল, যদি দুঃখের ভার নীরবে হৃদয়ে বহন করিতে হইল, যদি অপর কেহ আমার সুখ দুঃখের ভাগী না হইল, তবে আমা অপেক্ষা দুঃখী আর কে? এ জগতে এমন কয়জন লোক আছে যাহারা পরের হৃদয় বুঝিতে পারে? জগতের লোক পরের হৃদয় বুঝিতে চাহে না। তুমি দুঃখ প্রকাশ কর, অনেকে আগ্রহসহকারে বিষণ্ণবদনে তাহা শুনিবে; শুনিবে বটে, কিন্তু কয়জন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তোমার প্রকৃত দুঃখ বুঝিবে? যদি পৃথিবীর প্রতি হৃদয়, প্রতি হৃদয়ের জন্য কাঁদিত, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ থাকিত না—পৃথিবী স্বর্গ হইত। হরকুমার! তুমি চিরকাল আমার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী বলিয়া জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিতেছে তাহা তোমাকে জানাইতেছি ও চিরকাল জানাইব। বুধবার রজনীতে আমার নিরাশ হৃদয়ে আশার বীজ উপ্ত হইয়াছে, জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ লিখেন নাই।

কুসুমিকার মাতা রুগ্নশয্যায়। তাঁহার পীড়ার অবস্থা কল্য অপেক্ষা উত্তম। কুসুমিকা ও নীলাব্জিকা সাধ্যমতে তাঁহার সেবা করিতেছে। নীলাব্জিকা,

বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। বিনোদবিহারী বাবু প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর আর দ্বিতীয় সংসার করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার সংসারে আর কেহই নাই, কেবল একমাত্র কন্যা নীলাব্জিকাই তাঁহার শূন্যগৃহ আলো করিয়া আছে। নীলাব্জিকা কুসুমিকা অপেক্ষা এক বৎসরের বড়, শরীরের গঠন দেখিয়া তাঁহাকে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। নীলাব্জিকা সুন্দরী—তাহার রূপ শরীরে ধরে না। নীলাব্জিকা অবিবাহিতা—তাহার আজিও বিবাহ হয় নাই। বিনোদবিহারী বাবু লোকের কথায় কর্ণপাত করিবার পাত্র নহেন—তিনি বলেন, সংসারে আমার আর কেহই নাই, কেবলমাত্র ঐ কন্যা—আর কিছু দিন যা-ক, উহার বিবাহ দিয়া কাশীবাস করিব। কুসুমিকা ও নীলাব্জিকা শৈশব হইতেই এক স্থানে লালিত ও বর্দ্ধিত। উভয়ে উভয়কে ভগ্নীর অধিক ভাল বাসে। দুই জনে সর্ব্বদা একত্রে থাকে। কুসুমিকার মাতা পীড়িতা হওয়া অবধি নীলাব্জিকা সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করে। বৃদ্ধাও তাহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। কুসুমিকা ও নীলাব্জিকায় তাঁহার মনে প্রভেদ জ্ঞান ছিল না। নীলাব্জিকা আমার কাছে

পড়িত, আমিও তাহাকে সম্পূর্ণ স্নেহ করি। প্রদোষ-কাল। গগন সাগরের অপর পারে সান্ধ্য আদিত্য দিবা সতীর সহমরণের জন্য চিতাবহ্নি সাজাইয়াছেন; দুই একটা তালবৃক্ষ-চূড়ে সেই বহ্নিছটা এখন দেখা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বহ্নিছটা অন্তর্হিত হইল—চিতাবহ্নি নিবিল। সান্ধ্যতিমির, কেবলমাত্র গগন ও বৃক্ষচূড় আঁধার করিয়াছে। নিম্নে এখনও অস্ফুট আলোক রহিয়াছে। আমি প্রাসাদোপরি বেড়াইতেছি। আমাদিগের বাটীর পশ্চিম প্রান্তে সুরম্য-সোপানাবলিশোভিত এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তাহার চারিদিকে তাল, তমাল, ঝাউ, তিন্তিড়ী, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের সারি। আমি ছাদের পশ্চিম প্রান্তে আসিবামাত্র, নিম্নে, অস্ফুট আলোকে দেখিলাম—সেই পুষ্করিণীর সুরম্য সোপানোপরি বসিয়া নীলাজিকা কি ভাবিতেছে। ক্ষণেক এইরূপ থাকিয়া নীলাজিকা সোপান ত্যাগ করিয়া উঠিল। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল। ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়াছে মালা গাঁথিতে পারিল না। সে পুষ্পগুলি পুষ্করিণীর কালজলে ভাসাইয়া দিল। আবার সেই সোপানোপরি আসিয়া বসিল। পরে তাহার

কণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুটক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আজি ইহার কি হইয়াছে, একেলা এরূপ অস্থির ভাবে কাঁদিতেছে কেন, জানিবার জন্য ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ডাকিলাম, নীলাব্জিকা!—বালিকা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—নীলাব্জিকা! কাঁদিতেছ কেন? সে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুখ অবনত করিল, বোধ হইল যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম নীলাব্জ! কাঁদিতেছিলে কেন? নীলাব্জিকা কহিল—

"কই কাঁদি নাই ত।"

"তোমার চক্ষের পাতা এখনও ভিজা রহিয়াছে তুমি কাঁদ নাই ত কি? বল, তোমার কি হইয়াছে।"

"আজি তুমি কুসুমিকার মাতাকে দেখিতে যাও নাই?"

"গিয়াছিলাম, তাহাতে কি হইয়াছে?"

"কিছুই হয় নাই।"

"তবে জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

"করিলাম।"

"সে যাহা হউক, তুমি কাঁদিতেছিলে কেন? তোমার

কি হইয়াছে আমাকে কি বলিবে না? আমি কি তোমায় ভাল বাসি না?”

নীলাব্জিকা নীলাকাশ প্রতি চাহিল—নীল নৈশা-কাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্রালোকে দেখিলাম,—তাহার ফুল্লেন্দীবরতুল্য লোচনযুগল জলে পুরিয়া গিয়াছে। সে কহিল, “ভালবাসা বই কি। কিন্তু তুমি কি আমার এ দুঃখ বুঝিবে?”

“কেন নীলাব্জ, কেন? কবে আমি তোমার দুঃখ বুঝি নাই? কবে তোমার দুঃখ দেখিয়া কাঁদি নাই? তবে আজি কেন এ কথা বলিলে? তোমার কথায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তুমি অন্তরে কোন আঘাত পাই-য়াছ—তোমার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইয়াছে,তোমার চক্ষের কোলে কালিমা পড়িয়াছে, তোমার সে হাসি নাই। কুসুম বলিল, তুমি চুল বাঁধ না, কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহ না, সর্ব্বদা অন্য মনে কি ভাব! তোমার এ দুঃখ কেন?”

নীলাব্জিকা ইহার পর আর কিছুই বলিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট হইতে অপসৃতা হইল। আমি বিস্মিত হইলাম,—ভাবিলাম, ইহার দুঃখ সামান্যকারণসঞ্জাত নহে। হরকুমার! এই চিন্তাশূন্য

বালিকা-হৃদয়ের এ মর্ম্মভেদী দুঃখ কিসের, কিছু বুঝিতে পার?

তাং ২৭শে ভাদ্র }
১২৭০ সাল। }
তোমারই
বসন্ত কুমার।

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র।

ভাই বসন্তকুমার!

(১) তোমার দুইখানি পত্র আসিয়া হাজির। তোমার প্রথম পত্র বলিতেছে, কুসুমিকা তোমার জীবনের সহচরী ধর্ম্মপত্নী হইবেন। সুন্দর! ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা আর কি বলিব। আর তোমার দ্বিতীয় পত্রে, নীলাব্জিকার কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই বুঝিলাম না। তুমি লিখিয়াছ, তাহার কষ্ট সামান্যকারণসঞ্জাত নহে। ভাল, মনুষ্য কাঁদে কেন? অভাবে। বাঞ্ছনীয় পদার্থের অভাবে দুঃখের জন্ম। দুঃখ হইতে অশ্রুজল। এখন দেখিতে হইবে, নীলাব্জিকার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ? নীলাব্জিকা, বিবাহের বয়স অতিক্রম

করিয়াছে। বয়সে রমণীহৃদয়ে প্রেমতৃষ্ণা জন্মে। সেই তৃষ্ণা নিবারণের অভাবে, হৃদয় মর্ম্মপীড়িত হয়। আমার এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া তুমি হাসিও না। তুমি, নীলাজিকার পিতাকে বলিয়া তাহার বিবাহের উদ্যোগ কর—তাহার বরপাত্র দেখ।

(২) এক্ষণে আমার একটা কথা শুন। কালি বৈকালে হেম বাবুর বাগানে বসিয়া আছি। নিদাঘ-সমীরে বৃক্ষের শ্যামল পত্ররাজি মুখরিত হইতেছে, সমীরণ ভরে কোন কোন বৃক্ষাশ্রিতা লতিকা সোহাগে দুলিতেছে; পুষ্করিণীর স্বচ্ছবক্ষ সমীরে ঈষৎ চঞ্চল হইতেছে, পুষ্করিণীর স্ফাটিক বক্ষে দুই একটি বুদ্বুদ দরিদ্র-হৃদয়ান্তর্গত আশার ন্যায় নীরবে উঠিয়া দেখিতে না দেখিতেই মিলাইয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর চারিধারে বহুবিধ ফুলের গাছ। তাহাতে দেশী, বিলাতী অযুত কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। শ্বেত, পীত, রক্ত, জরদ নানা বর্ণের ফুলের রাশি। তন্মধ্যে দেশী ফুলই অধিক—যুথীকা, চম্পক, মল্লিকা; মালতী, সেউতির সুগন্ধে বাগান আমোদ করিতেছে। আমি একটী অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া আছি, তাহাতে স্তবকে স্তবকে অশোক ফুল ফুটিয়াছে। তাই বসন্ত! কুসুমসুন্দরীগণ

রূপে গুণে আমার প্রাণ পাগল করিল। ভাবিলাম, এই মোহিনী পুষ্পসুন্দরীগণ কোথা হইতে আসিল! বিধাতার সৃষ্টসৌন্দর্য্যের মধ্যে ইহারা অতুল! ইহা-দিগের সহিত নারীজাতির তুলনা দেয়! ছি! ইহাদের সহিত নারীজাতির তুলনা! নারীজাতির রূপে বিষ আছে, ইহাদের রূপে বিষ নাই। নারীজাতি রূপের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইহারা রূপের গর্ব্ব জানে না। ইহাদিগের রূপ অতি পবিত্র ও তুলনা রহিত। কন্টকাকীর্ণ শুষ্ক গোলাব লতিকা দেখিলে, কখনই বোধ হয় না যে ইহা এমন সুন্দর রূপের রাশি প্রসব করিবে। কন্টকময় নীরস শাখার অন্তরে এত রূপ কোথায় ছিল! বসন্ত-কুমার! আজি রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে—সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। রাশি রাশি ফুল দেখিলে আমার যত সুখ হয়, এত সুখ বুঝি আর কিছুতে হয় না। মরি! এত রূপসী ফুলের রাশি, ইহারা কতক্ষণের জন্য পৃথি-বীতে আসিয়াছে। ইহাদের জীবন অতি ক্ষুদ্র, মুহূ-র্ত্তের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইহাদের ফুলজন্ম ফুরাইবে। ইহার মধ্যেই জন্মিল, বর্দ্ধিত হইল, ফুটিল আবার শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। কেহ জানিল না, শুনিল না—নির্জ্জনে কাননের কোলে ফুটিল,

শুকাইল। কেহ ইহাদের জন্য এক কোঁটা চক্ষের জল ফেলিল না—মনুষ্যহৃদয় সেরূপ নহে। ফুলটি ফুটিলে কত সুন্দরী আসিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "আহা! কি সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে," বলিয়া তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া খোপায় গুজিলেন—কুসুমসুন্দরী নিরুপায়ে তাঁহার কবরীভূষা হইল। সুন্দরী সুখী হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ফুলবালা বৃন্তচ্যুত হইয়া অকালে শুকাইল। ফুল শুকাইলে তাহার আদর থাকে না। সুন্দরী ফুল শুকাইয়াছে দেখিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মরি! এই নির্ম্মম সংসারে, কুসুমসুন্দরীগণ কেন জন্মে, কেন ফুটে, কেন শুকায়! ফুটিয়া এত শীঘ্র শুকায় কেন? বুঝি, কঠোর মনুষ্যহস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য! কতকগুলি আবার সাহস করিয়া ফুটে না—কোরকে শুকায়। জলবুদ্বুদ উঠিতে না উঠিতে মিলায়; নীলাকাশে রামধনু এই হাসিল, এই ডুবিল। ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকায়, (কি এই ফুল, কি নারীকুল)। ঊষার সীমন্তে বালসূর্য্য কতক্ষণ জ্বলে? পল্লবাগ্রে শিশিরমুক্তা কতক্ষণ দুলে? কোমল নীল গগনে চন্দ্রমণ্ডলের চারি ধার কখন কখন স্নিগ্ধোজ্জ্বল পীত বর্ণে রঞ্জিত হয়, ভাবা কথায় তাহাকে "চন্দ্রের সভা" কহে। নীলাকাশে চন্দ্রদেবের

সে বাহার, সে সৌন্দর্য্য কতক্ষণ থাকে? নিমেষমধ্যে সে বাহার কোথায় লুকায়; সে নয়নস্নিগ্ধকরী মধুর দিব্যসৌন্দর্য্য কোথায় ভাসিয়া যায়! তাই বসন্ত! বুঝি, যাহা কিছু সুন্দর—তাহাই ক্ষণস্থায়ী। সৃষ্টিকর্ত্তা,মানব অদৃষ্টে সৌন্দর্য্যের পূর্ণভোগ লিখেন নাই। বাল্যকাল হইতে কত নব নব সৌন্দর্য্য নয়ন পথে পড়িয়াছে—তাহাদের মধ্যে কয়টি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইয়াছি! এ জনমে বুঝি ভাল করিয়া কিছুই দেখা হইল না;——

"ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

যাহা হউক,সেই কুসুমিত অশোকবৃক্ষমূলে বসিয়া,ফুল-কুলের নবীন ঢল ঢল রূপ দেখিয়া চিত্ত উদাস হইল। সংসার ছাড়িয়া ইহাদিগকে লইয়া সন্ন্যাসী হইব স্থির করিলাম। গৃহের নারীকুলের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, তাহার এতগুলি সুন্দরী সতিন হইলে সে গৃহ-পুষ্পটী শুকাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার সুন্দরী সতিন-গুলির সহিত আমার প্রেম কিরূপ বুঝিতে পারিলে, কখনই শুকাইবে না। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিব, যে এই কুসুমসুন্দরীগণের সহিত আমার পার্থিব প্রণয়

নাই, তবে উহাদিগের সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ, উহাদিগকে লইয়া সন্ন্যাসী সাজিতেও রাজি আছি।

(৩) তোমার বিবাহ হইবে। কবে হইবে? দিন স্থির হইয়াছে কি না লিখিবে। বিবাহের সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিবে, আমি সস্ত্রীক যাইয়া তোমার বিবাহকার্য্য সমাধা করিব। বিবাহ হইলে, কৌলিক প্রথানুসারে তোমার ফুলশয্যাও হইবে। সেই দিবস, পুষ্পসুন্দরীগণ আসিয়া বর কন্যার প্রীতি সাধন করিবেন—ফুল সাজে সাজিয়া, ফুলের শয্যা রচনা করিয়া, ফুলবাসরে বর কন্যা পবিত্র প্রণয় রসে ভাসিবে। কত নারীফুল, তোমার ফুলবাসরে সরস মজলিস করিবে—গৃহ ফুলময় হইবে। বিবাহ উৎসব মধ্যে ঐ একটি সুখের দিন। আমার জীবনের সে সুখবাসর চলিয়া গিয়াছে—তাহার মধুময় স্মৃতি আজিও আছে। তাই বলিয়া আমাকে "বিয়ে-পাগলা" মনে করিও না। আমি আর সে দিবসের কামনা করি না—জীবনে সে দিবস একবার আসাই ভাল। তোমার ফুলবাসরের শীঘ্র আয়োজন কর, বিবাহের দিন ধার্য্য হইলে আমাকে সংবাদ দিতে বিলম্ব করিবে না। অদ্য ইতি—

তাং ৬ই আশ্বিন ১২৭০ সাল। } তোমারই হরকুমার শর্ম্মা।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র

প্রিয়ম্বদ হরকুমার !

অদ্য মাসেক হইল, তোমার এক খানি পত্র পাইয়াছি। মনশ্চাঞ্চল্য হেতু এ পর্য্যন্ত তোমাকে কিছুই লিখিতে পারি নাই। আজি এক মাস হইল, কুসুমিকার মাতা শ্মশানসৈকতে শয়ন করিয়াছেন। সেই অবধি কুসুম শুকাইতেছে। সর্ব্বদাই কাঁদে, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া আবার কাঁদে। কোনরূপে তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছি না। সেই নীল, পদ্মপলাশনীভ মধুমাখা নয়ন দুইটি সলিলস্নাত দেখিলে বড়ই কষ্ট হয়। কি করিলে, কুসুমিকা লীলাময়ী প্রকৃতির সহিত আবার আমোদ করে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, এই যে রঙ্গময়ী মৃদুল প্রদোষপবন কুসুমের সৌরভ মাখিয়া, তাহাকে নত করিয়া, তাহার [illegible] চলিয়াছে, কি করিলে কুসুমিকা উহার ন্যায় আমোদ করিবে !

এই যে সুগন্ধি অশোকস্তবক শ্যামল পত্রকোলে হাসিয়া দুলিতেছে, কি করিলে কুসুমিকা ইহাদের ন্যায় হাসিবে! ঐ যে কুমুদকুসুম ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় ঈষদাবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া ফুটু ফুটু ভাবে হাসিতেছে, কি করিলে আমার কুসুমকুমুদ উহার ন্যায় সুখে ভাসিবে! এইরূপ ভাবিতেছি ও বেড়াইতেছি, ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সান্ধ্যাদিত্যের স্বর্ণ কিরণ এতক্ষণ গাছের পাতায় পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, এক্ষণে পাতা ছাড়িয়া শূন্যে ডুবিল—গাছের পাতা কাল হইল। সরসীর কোলে হাঁসগুলি এতক্ষণ ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছিল, তাহারা খেলা ছাড়িয়া তীরে উঠিল। পুকুরের কাল জলে কাল ছায়া আরো কাল হইল—ক্রমে আরো কাল—তাহার পর জলে ছায়া মিশিল। সান্ধ্যগগনে পথহারা সুন্দরীর ন্যায় একটী নক্ষত্র দেখা দিল। তখন আর অন্ধকারে থাকিয়া কি করিব ভাবিয়া গৃহে ফিরিলাম। কুসুমকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষবাতায়ন পার্শ্বে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। স্বর শুনিয়া বাহির হইতে জানেলার ভিতর দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, আমার সেই জীবন্তকুসুমরূপিনী, আলুলায়িতকুন্তলা, মাতৃশোকা-

তুরা কুসুমিকা, ভগ্নী ভুবনমোহিনীর কণ্ঠে বাহুলতা বেষ্টন করিয়া মুখ লুকাইয়া অস্ফুটে কাঁদিতেছে। ভুবনের চক্ষুও জলে পুরিয়াছে; ভুবন সস্নেহে কুসুমিকার কোমল চিবুক ধরিয়া বসনাগ্রভাগ দিয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন, কহিলেন, "তা আর কাঁদিলে কি হইবে বল! কাঁদিলে ত কোন উপায় হইবে না। তুমি কাঁদিলে আমি কাঁদিব, দাদা কাঁদিবেন, ছিঃ! কাঁদিও না।" কুসুম বলিল, "আমি কি ইচ্ছা করিয়া কাঁদি?"

"অমন কোরো না, ওসব ভুলে যাও। দেখ, দাদা তোমাকে বড় ভাল বাসেন—তুমি কাঁদ বলে তাঁহার চক্ষু দুইটি সর্ব্বদাই ছল্ ছল্ করে। আচ্ছা, দাদার সহিত তোমার বিবাহ হইলে কি তুমি সুখী হইবে না?"

"হইব বৈ কি।"

"হইব বৈ কি? ও কি রকম কথা, কি করিলে তুমি সম্পূর্ণ সুখী হও?"

"ইহা অপেক্ষা আমার কিছুতেই অধিক সুখ হইবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি বল, আমার কাছে তুমি কথা লুকাইবে? তুমি কি আমাকে ভাল বাস না?"

"তোমাকে ভাল বাসি না ত কি! নীলাজিকাকে যেমন ভাল বাসি, তোমাকেও তেমনি ভাল বাসি। তোমরা ভিন্ন আমার মনের কথা বলিবার আর কে আছে?"

"আর একজন আছে।"

"আচ্ছা, তোমার সুখে যদি আর কাহাকেও চির-জীবন কাঁদিতে হয় তাহা হইলে কি তুমি সুখী হইতে ইচ্ছা কর?"

"একজনকে কাঁদাইয়া কি কখন সুখী হওয়া যায়!"

"আমার সুখ হইবে না—আমি সুখ চাই না।"

"ইহার অর্থ কি, তুমি কাহার মনে ব্যথা দিয়াছ?" এই বলিয়া ভুবন, কুসুমিকার চিবুক ধরিয়া কহিল—"এমন কুসুমকোমল, সরল মুখ যাহার, সে কি কাহার মনে ব্যথা দিতে পারে? কুসুম! তুমি কি কেবল মার জন্যই ভাব? আমার বোধ হয়, তোমার অন্তরে অন্য কোন ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে। আর কি ভাব? আমার মাথা খাও, আমাকে বল।"

"ভাবি—আমার জন্যই আর একজনের সর্ব্বনাশ হইবে!"

"কাহার সর্ব্বনাশ হইবে?"

কুসুম কিছুই বলিল না। করকপোলবিন্যস্ত হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভুবনমোহিনী, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি ভাবিতেছ, তোমার এ দুঃখ কেন?"

"বিধাতার ইচ্ছা—"

পরে কুসুমিকা একটী পতনশীল নক্ষত্রের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"ভুবন! নক্ষত্রটী মনের দুঃখে খসিয়া পড়িল, না?"

"হইবে।"

"উহার মনে কিসের দুঃখ?"

"তুমিই জান।"

"কেন তুমি কি কিছু জান না? তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

"করিয়াছি!"

"কেন, আমি কি করিলাম?"

"তুমি আমাকে ভালবাস না বলিয়া।"

"তোমার মিথ্যা কথা—আমি তোমাকে ভালবাসি না ত কি?"

"আমার সত্য কথা—তুমি আমাকে ভাল বাসিলে আমার নিকট কথা লুকাইবে কেন?"

"পরের সুখের পথে আর কাঁটা হইব না, পরে কপালে যাহা আছে হইবে। তোমার নিকট আমি কথা লুকাইব না—তোমাকে সকল কথা বলিব কিন্তু আজি নহে" এই বলিয়া কুসমিকা, ভুবনের নিকট হইতে চলিয়া গেল। আমিও কুসুমিকার বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিলাম। আমার ত এক্ষণকার সংবাদ এই। তোমার ও তোমার প্রিয় গৃহিণীর কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি।

তাং ৮ই কার্ত্তিক
১২৭০ সাল।

তোমারই
বসন্তকুমার।

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র।

বন্ধুপ্রবর বসন্ত!

মনুষ্য যাহা আশা করে, প্রায় তাহা ঘটে না। আমি আশা করিয়াছিলাম, সস্ত্রীক যাইয়া তোমার বিবাহ উৎসবে মাতিব, তাহা ত এক্ষণে কিছু দিনের জন্য হইতেছে না। তোমার ভগ্নী ও কুসুমিকার কথোপ-কথন সবিশেষ শুনিলাম। শুনিলাম বটে, কিন্তু শুনিয়া দুঃখ হইল মাত্র। তোমারও মনের অবস্থা ভাল নহে, আমারও তাহাই। আজি দুই দিবস হইতে আমার হৃদয়ে কি এক অশান্তি বিরাজ করিতেছে। আমার এ হৃদয়াশান্তি কোথা হইতে আসিল, শুন। ইতিমধ্যে এক দিবস সন্ধ্যার পর জাহ্নবী তীরে বসিয়া আছি। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। নৈশবায়ু তাড়িত হইয়া পূর্ণসলিলা ভাগীরথী তর তর বেগে অনন্ত উদ্দেশে ছুটি-য়াছে। জাহ্নবীর রজত বক্ষে, চন্দ্রের রজত ছায়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। জাহ্নবীজল, জ্যোৎস্না মাখিয়া জ্বলিতেছে। সেই কৌমুদীবিধৌত জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে কতকগুলি শ্বেত পদ্মকোরক ভাসিয়া

যাইতেছিল। জাহ্নবীবক্ষে, এই পদ্মকোরকগুলি কোথা হইতে আসিল জানি না। পদ্মগুলির শুষ্ক ও মলিন। নদীস্রোতবাহিত, শ্বেতকমলসুন্দরীকুলের সেই মলিন রূপরাশি দেখিয়া বঙ্গের বালবিধবা নারীর মুখ মনে পড়িল। ভাবিলাম এই জাহ্নবীস্রোতবাহিত কমলকোরকগুলি, পতির কোলে ফুটিতে না পাইয়াই যেন অনাথিনীর ন্যায় নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। আর বঙ্গের কত পতিবিয়োগবিধুরা জীবন্ত কমল, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে সংসারস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। নদীস্রোতবাহী দুখিনী কমলকুল ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় যাইবে জানে না—সংসারস্রোতবাহী দুখিনী কমলকুল ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় যাইবে জানে না। ইহাদের কেহ নাই, তাহাদেরও কেহ নাই। ইহাদের দলরাজী নদীস্রোতচ্ছিন্ন; তাহাদিগের প্রফুল্ল দলরাজীও কঠোর সংসার স্রোতে ছিন্ন ও বিশুষ্ক। কাননের কোলে, কত শত ভ্রমরগুঞ্জস্পন্দিত কুসুমসুন্দরী সমীরণভরে দুলিতেছে; কত শত কুমুদ, চন্দ্রকরে ফুটিতেছে, কত যূথিকাকলি ও রজনীগন্ধার মুখ ফুটিতেছে, কত চম্পক কলিকা রূপের বাহার দিতেছে কিন্তু এই নদীস্রোতবাহী, পতিবিয়োগা, শ্বেতবসনা কমলকুল তাহা-

দের সহিত মিশিতে না পারিয়াই যেন দূরে নদী স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। তাহাদের সুখের দিন আছে— তাহারা ফুটিতেছে, দুলিতেছে, হাসিতেছে। ইহাদের সুখের দিন ফুরাইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে ইহাদের হৃদয় মিশিল না—ইহারা দুখিনীর ন্যায় দূরে নদী স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সংসারের কোলেও কত শত জীবন্ত কুমুদ, যূথিকা, চম্পক, রজনীগন্ধা সুখের হিল্লোলে পতি-কোলে সোহাগে গলিয়া ফটিতেছে—আর ঐ নদীস্রোত-বাহী পদ্মকোরকের ন্যায় কত শত জীবন্ত কমল সংসার-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারাও সংসারের কুমুদ, যূথিকা, চম্পক, রজনীগন্ধার সহিত প্রাণ ভরিয়া মিশিতে পারে না। কুমুদ, যূথিকা, চম্পকের চল চল সুখ দেখিয়া তাহাদের আঁধার হৃদয়ে কখন পূর্ব্ব-সুখ-স্মৃতি, কখনও নবসুখআশা বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া দেখিতে না দেখিতেই সেই মেঘাবৃত হৃদয়াকাশে মিলাইয়া যায়—পরে দুঃখবহ্নি হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে। ইহারই জন্য তাহারা যেন প্রাণ ভরিয়া উহাদের সঙ্গে মিশিতে পারে না। কুমুদ, যূথিকা, চম্পক, রজনী-গন্ধার সুখের দিন আছে; তাহারা সংসারকে সুখের সঙ্গীত শুনাইতেছে—সংসার তাহাদিগকে লইয়াই ব্যস্ত

—সংসার তাহাদিগের কলকণ্ঠে মোহিত ও তন্ময়। আর সংসারের বিধবাকমলগুলির সুখের দিন ফুরাইয়াছে তাহারা সংসারকে অহরহ শোকের সঙ্গীত শুনাইতেছে। সুখের সঙ্গীতে সংসার মোহিত ও তন্ময়, দুখিনী কমল-কুলের শোকের ধ্বনি কে শুনে? শূন্যে—তাহাদের বিষাদ সঙ্গীত মিশাইতেছে। তখন সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল জাহ্নবীতীরে বসিয়া নদীস্রোতবাহী কমলকুঞ্জের প্রতি দেখিতে দেখিতে সহসা যেন দিব্যচক্ষু পাইলাম—প্রদোষ-কমলসম শত শত বঙ্গ বিধবার মলিন মুখচ্ছবি আমার চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল। তাহাদের চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে; যেন সেই সকল অনা-থিনী বঙ্গকামিনী সজল নয়নে সংসারকে ডাকিয়া বলি-তেছে—"আমাদের চক্ষের জল কি শুকাইবে না?" সেই সকল মলিন মুখচ্ছবি আর দেখিতে সাহস হইল না। নৈশাকাশ প্রতি চাহিলাম—আকাশ চন্দ্রকরে উজ্জ্বল, কিন্তু আমার হৃদয়ে—চন্দ্র, তারা সকলি নিভিয়া গিয়াছে; হৃদয় মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। জাহ্নবীর বিপুল প্রশান্ত মূর্ত্তি, চন্দ্রকরোজ্জ্বল আকাশের মোহিনী ছবি আমার হৃদয় পটে অঙ্কিত হইল না। সেই অন্ধকার, উদাস চিত্ত লইয়া গৃহে ফিরিলাম। হৃদয়ের সে অন্ধকার

আজিও ঘুচে নাই। যাহা হউক, তোমার সংবাদ জানিতে আমি বড়ই উৎসুক। কুসুমিকার মনের অবস্থা ভাল নহে; তিনি কিরূপ থাকেন ও নীলাঞ্জিকারই বা সংবাদ কি, তুমি কুসুমিকার দুঃখের কথা কিছু জানিতে পারিয়াছ কি না, আমায় ত্বরায় লিখিবে। আমি তোমাদিগের সংবাদের জন্য বড়ই ব্যগ্র রহিলাম। পরে, প্রার্থনা করি তোমার বর্ষাম্লান কুসুমকমলটী যেন শীঘ্রই নববারিসিঞ্চিত কদম্বের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। ইতি—

তাং ১২ই কার্ত্তিক
১২৭০ সাল।

হরকুমার শর্ম্মা।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র।

ভাবুকবর হরকুমার!

কালি নিশীথে উদ্যান মধ্যে বেড়াইতেছি। রাত্রি ঘনান্ধকার। আকাশে কতকগুলা গাঢ় কাল মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে কিয়দ্দূরে সেই অন্ধকারময় উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে—কাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কে, দেখিবার জন্য নিকটে যাই-

লাম। তাহার নিকট না যাইতে যাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে উঠিয়া দাঁড়াইল সে নীলাব্জিকা। আমি কহিলাম—"নীলাব্জিকে! তুমি এ অন্ধকারময়ী নিশীথে এখানে কেন?"

"কেন, অন্ধকারে কি বেড়াইতে নাই?" পরে ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"যাহাদের হৃদয়ে আলোক আছে তাহারা আলোকে যাউক।"

"ভাল, তোমার হৃদয় অন্ধকার হইল কিসে তাহা কি শুনিতে পাই না?"

"মনুষ্য অকরুণ বলিয়া।"

"কেন, কে তোমার প্রতি অকরুণ হইল?"

"যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—সেই।"

"কাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস? বল—আমার নিকট লজ্জা করিও না—বল।"

নীলাব্জিকা কিছুই বলিল না; তাহার নীলেন্দীবর তুল্য লোচন যুগল আমার মুখের প্রতি স্থাপিত করিয়া কি দেখিতে লাগিল। আমি কহিলাম--

"অমন করিয়া অন্য মনে কি ভাবিতেছ?"

"ভাবিতেছি—কত দিন তোমার সম্মুখে এই বাপী-তটে মেঘের ঘোরাল ঘটা দেখিয়া মেঘবাতস্পৃষ্ট ময়ূরীর

ন্যায় প্রফুল্লিতা হইয়াছি, কিন্তু আজিকার এই মেঘে তোমার সম্মুখে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হইতেছে কেন?”

আমি বিস্মিত হইলাম, কহিলাম—“আমাকে দেখিয়া ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হইতেছে! কেন, আমি তোমার কি করিয়াছি?”

“তুমি আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বালিয়াছ।”

হরকুমার! তন্মুহূর্ত্তে কণ্ঠদেশে ঊর্দ্ধফণা ফণী দেখিলে আমি অধিক চমকিত হইতাম না। আমি কহিলাম—“নীলাঞ্জিকা! তোমার নিকট হইতে আমি এরূপ উত্তরের আশা করি নাই, আশা কি, স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি অপাত্রে তোমার প্রণয় ন্যস্ত করিয়াছ—তোমার আশা পূর্ণ হইবে না।” এই কথার পর, আমি উদ্যান মধ্যে মর্ম্মপীড়িত হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পরে নীলাঞ্জিকাকে কহিলাম—“শুন নীলাঞ্জিকা, তোমার এই বালিকা বয়স—এই বয়সে জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিও না। তুমি এ সকল কথা বিস্মৃত হও।”

“বসন্তকুমার! ভালবাসা কি ইচ্ছা করিয়া ভুলা যায়? আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তুমি আমাকে চিরকালের জন্য দুখিনী করিও না।”

“নীলাঞ্জিকা! এখনও বলিতেছি সাবধান—ইচ্ছা

করিয়া হৃদয়ে বিষবীজ রোপণ করিও না। তোমাকে স্নেহ করি বলিয়া এত কথা বলিলাম, আর তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইবে না।”

“নির্দ্দয়! আমি তোমাকে কেন ভাল বাসিলাম? ভাল বাসিলাম ত ভুলিতে পারি না কেন?”

আকাশে যে কতকগুলা কাল মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল—সমস্ত আকাশ কাল হইল; আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। হরকুমার! নীলাজিকাই কি কুসুমিকার দুঃখের মূল?

তাং ১৫ই কার্ত্তিক ১২৭০ সাল। তোমারই বসন্ত।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয় হরকুমার!

আজি সপ্তাহকাল হইল তোমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছি; আজিও তোমার কোন সংবাদ পাইলাম না কেন? আমার এখানে আর এক ঘটনা উপস্থিত। জগদীশ আমার হৃদয়ে শান্তি দিবেন না। আজি দুই দিবস

হইল আমার কুসুমিকা আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে জানি না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিতেছি কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিতেছে না। কুসুমিকার হৃদয় আমি আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কি অপরাধে কুসুম আমাকে ত্যাগ করিল? কুসুম কি আমাকে সন্দেহ করিয়াছিল? কিসের সন্দেহ? নীলাব্জিকার সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ করিয়াছিল? হইবে। আমার স্মরণ হইতেছে, এক দিন সে আমার ভগ্নীর নিকট বলিয়াছিল—'পরের সুখের পথে আর কাঁটা হইব না।' কাহার সুখের পথে সে কাঁটা হইবে না? নীলাব্জিকার সুখের পথে? তবে কি কুসুম মনে করিয়াছিল যে আমি নীলাব্জিকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী? বুঝি তাহাই—নতুবা আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে কেন? সন্দেহ কি ভয়ানক বিষ! আর এ সন্দেহের ভিত্তিই বা কোথায়? আমি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নীলাব্জিকা তাহার মনের দুঃখ কুসুমকে বলিয়া থাকিতে পারিবে, তাহাতেই বা কি হইয়াছে, আমার প্রতি কুসুমের সন্দেহের সেই কি যথেষ্ট কারণ? জানি না, নির্বোধ বালিকা কিরূপ বুঝিয়াছিল। যাহা হউক, আমি আজি দ্বিপ্রহরে বহির্বাটীতে বসিয়া চিন্তাকুল

হৃদয়ে এই সমস্ত ভাবিতেছি, এমত সময় বেচারাম নামক অনৈক ভৃত্য আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে আমাকে একখানি পত্র দিল। পত্র খানির শিরোনামায় নীলাব্জিকার নাম লিখিত—হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। বেচারামকে বলিলাম—'তুই এ পত্র কোথায় পাইলি?' সে কহিল,আজি দুই দিবস হইল কুসুমিকা তাহাকে এই পত্রখানি নীলাব্জিকার নিকট দিয়া আসিতে কহে, কিন্তু তাহার কি কার্য্য বশতঃ সে পত্র পৌঁছাইয়া দিতে পারে নাই—এক্ষণে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। আমি তাহাকে বিদায় দিয়া পত্রখানি পাঠ করিলাম। হর-কুমার! কুসুম, নীলাব্জিকাকে কি এতই ভাল বাসে যে তাহার সুখের জন্য আমাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল! না, আমার প্রতি সন্দেহই প্রধান মুল, ইহা একটা ওজর মাত্র? কুসুমের লিপি খানি আমি রাখিলাম, তাহার নকল তোমাকে পাঠাইতেছি——

কুসুমিকার পত্র।

প্রিয় ভগ্নি!

কাহারও মনে ব্যথা দিতে নাই। তুমি আমার, অপর কেহ নহ—প্রিয় সই—প্রাণের ভগ্নী। তোমার

মনে আমি ব্যথা দিব? আজি কালি তোমার মুখ দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়—তোমার আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। ভগ্নী! তুমি যাহার জন্য কাঁদিতেছ, তিনি কি তোমার জন্য কাঁদেন? বুঝি, আমার জন্য তিনি কাঁদিতে পারেন না। আমি তোমার সুখের পথে প্রধান কণ্টক। আমি এখানে থাকিলে, তোমার মৃত্যুর কারণ হইব। আমি এখানে থাকিতে, তুমি বসন্তকুমারকে পাইবে না। আমি চলিলাম—কোথায় চলিলাম জানি না। বিধাতার নিকট প্রার্থনা, তুমি বসন্তকুমারকে বিবাহ করিয়া সুখী হও। আমার—আমার জন্য দুঃখ করিও না—আমাকে মনে করিয়া কাঁদিও না।

তোমারই
হিতার্থিনী ভগ্নী
কুসুমিকা।

হরকুমার! এই বালিকার হৃদয় অপূর্ব্ব। নীলাজিকাকে সুখী করিবার জন্য সে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। কুসুম আমাকে ভাল বাসিত না—আমি প্রতারিত হইয়াছি। কিন্তু আমি ত তাহাকে না দেখিয়া বাঁচিব না।

এত যত্নেও কোন অনুসন্ধান হইল না, কুসুমিকার ত আর কেহই নাই, সে কোথায় আশ্রয় লইল, আমি বিস্মিত হইয়াছি! তাহার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হইতেছে। নির্ব্বোধ বালিকা ইচ্ছা করিয়া বিপদাগার সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। হাঁ—আর এক কথা, যখন আমি কুসুমিকার পত্র পড়িতে ছিলাম, নীলাব্জিকা আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাঁহার মূর্ত্তি বিষণ্ণা, কাতর স্বরে আমাকে কহিল—"কুসুমিকার কোন সংবাদ পাইলে কি?" আমি কুসুমিকার পত্র, নীলাব্জিকার হস্তে দিয়া কহিলাম—"কোথায় সংবাদ পাইব? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে! এই পত্র পড়।" নীলাব্জিকা পত্র পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"কুসুম, তোমারই জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল; তুমি কালামুখী তোমার মনের পাপ কেন তাহাকে জানাইয়াছিলে?" নীলাব্জিকা কিছুই বলিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া যাইতেছিল—আমি তাহাকে ডাকিলাম, কহিলাম—'নীলাব্জিকে, কিছু মনে করিও না; আমার মনের স্থিরতা নাই—তোমাকে একটা রূঢ় কথা বলিয়াছি।' নীলাব্জিকা কহিল—"বসন্তকুমার! কুসুমিকা মানবী নহে—কুসুমিকা দেবী! আমি কালামুখী না

হইলে আজি এ সর্ব্বনাশ ঘটিবে কেন !" আমি কহিলাম—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে যাও—আমার চিত্তের স্থিরতা নাই।" নীলাজিকা, কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে অপসৃতা হইল। হরকুমার ! নীলাজিকা আজি কালি আমার চক্ষের শূল হইয়াছে, তাহার মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পারি না। প্রায়ই তাহাকে অনর্থক ভর্ৎসনা করিয়া থাকি, তাহার চক্ষু জলে পুরিয়া যায়, আমি কি করিব !

তাং ২৩ শে কার্ত্তিক
১২৭০ সাল। } তোমারই
বসন্ত কুমার।

পুঃ—

কুসুমিকার সন্ধানের ক্রটি করিতেছি না। প্রতি গ্রাম, মেলা, কাঁড়ি, হাট, বাজার ও স্নানের ঘাটে তাহার সন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছি, সংবাদ পত্রিকায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত দিইয়াছি। কিছু দিন দেখি ইহাতে কি ফল দর্শে, পরে কুসুমের অন্বেষণার্থে দেশত্যাগী হইব।

বসন্ত।

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উত্তর।

অভিন্ন-হৃদয় বসন্ত!

তোমার দুই খানি পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রথম পত্রের উত্তর এক্ষণে কিছুই লিখিলাম না। সে বিষয়ের আন্দোলনে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। কুসুমিকার ভালবাসার প্রতি তুমি সন্দেহ করিয়াছ। তুমি লিখিয়াছ, "আমি প্রতারিত হইয়াছি—কুসুম আমাকে ভাল বাসিত না।" তোমার এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। তুমি সে পবিত্র ভালবাসায় সন্দেহ করিও না, তুমি প্রতারিত হও নাই। কুসুমিকার সুকুমার হৃদয়ে নিঃস্বার্থপরতা ও পরদুঃখকাতরতা বড়ই প্রবল—এই দুই স্বর্গীয় বৃত্তির প্রাবল্যে কুসুম পরোপকার মন্দিরে আপন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বলি দিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি অধীর হইও না, কুসুমিকা যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি তোমাকে না দেখিয়া কয়দিন থাকিতে পারিবেন! আমি শীঘ্রই দেবপুর যাইবার জন্য রওয়ানা

হইব। আমি তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে তুমি কদাচ দেশত্যাগ করিও না। ইতি—

তাং ২৬শে কার্ত্তিক
১২৭০ সাল।

তোমারই মঙ্গলপ্রার্থী
হরকুমার শর্ম্মা।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র।

বন্ধুবর হরকুমার !

যে দিবস তোমার পত্র পাইলাম, তৎপর দিবস সন্ধ্যাকালে আমি গৃহত্যাগ করিয়া কুসুমের অন্বেষণার্থ বাহির হইলাম। গৃহে মন তিষ্ঠিল না। তোমার আসিবার কাল পর্য্যন্ত আমার দুর্ব্বল হৃদয় অপেক্ষা করিল না। তাহার পর, দেখিতে দেখিতে দুই চারি দিবস অতিবাহিত হইল। এক দিবস নিশীথে একটি জনশূন্য গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রাম জঙ্গলময়। সেই জঙ্গল মধ্যে স্থানে স্থানে দুই এক খানি ভগ্নাট্টালিকা অস্ফুটচন্দ্রালোকে বিকৃত মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—তাহাতে এক্ষণে মনুষ্য বসতির কোন চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। গ্রামের সর্ব্বত্রই জঙ্গল;

সেই জঙ্গল মধ্যে স্থানে স্থানে ভগ্ন সৌধস্তূপ,ভগ্ন কুটীর—একণে মনুষ্য বসতির চিহ্নমাত্র বিরহিত। অস্ফুট চন্দ্রালোকে বন্যবায়ু বিত্যাড়িত বৃক্ষপত্রের ঝর্ ঝর্ শব্দ ও মধ্যে মধ্যে বন্যপশুর কর্কশ কণ্ঠ শুনিতে শুনিতে সেই ভয়াবহ লোকশূন্য গ্রাম অতিক্রম করিয়া এক জলাভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও কোন গ্রামের চিহ্ন আছে কি না। কোথাও কোন গ্রামের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। দেখিলাম, যে স্থান দিয়া আমি চলিতেছি উহা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র নহে—আলোক অস্ফুট, জ্যোৎস্না কখন ফুটি-তেছে কখন মুদিতেছে। সেই অস্ফুট আলোকে, দূরে, সম্মুখে ছায়ার ন্যায় কতকগুলি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি লক্ষিত হইল। আমি চলিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ইহারা মন্দ লোক হইলেও হইতে পারে। পরে আর অগ্রসর না হইয়া ক্ষণেক সেইখানে অপেক্ষা করিলাম। পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সেই সকল দীর্ঘ ছায়া আর দেখিতে পাইলাম না। তাহারা কোথায় গেল? প্রান্তর পার হইয়া গিয়া থাকিবে! কিন্তু মাঠের সীমায় ত কোন চিহ্ন দেখিতেছি না, পথভ্রম হইল কি

না বুঝিতে পারিলাম না। অবিরাম চলিতে লাগিলাম—যাইতে যাইতে কিয়দ্দূরে, সম্মুখে ঘনবৃক্ষশ্রেণী অন্ধকারে প্রাচীরবৎ লক্ষিত হইল, দেখিলাম সেইখানেই মাঠের শেষ হইয়াছে। মাঠ পার হইয়া একখানি গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতেই সেই নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক ভয়ানক হুঙ্কার ধ্বনি হইল। নৈশাকাশে তাহার কঠোর প্রতিধ্বনি না মিলাতেই দেখিলাম এক জন লোক রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে আমার নিকট আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কে তুমি? কোথায় যাইতেছ? শীঘ্র পলাও।" আমি বলিলাম—"কি হইয়াছে?" সে বলিল—"গ্রামে ডাকাইত পড়িয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, প্রাণের মায়ায় পলাইতেছি।" প্রান্তরবিহারী সেই সকল দীর্ঘ মনুষ্য মূর্ত্তির কথা আমার স্মরণ হইল, ভাবিলাম এ দস্যু তাহারাই। আমি বলিলাম—"আমি বিদেশী, পথিক, কোথায় পলাইব? কে আমায় আশ্রয় দিবে?" এই সময় আবার সেই ভয়াবহ হুঙ্কার ধ্বনি শ্রুত হইল। আগন্তুক কহিলেন, "এখানে আর দাঁড়াইও না, প্রাণের মায়া থাকে ত আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া তিনি দৌড়াইতে লাগিলেন।

আমিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিলে, আমার সঙ্গী কহিলেন,"এইখানে একটু বিশ্রাম করুন—এই স্থান অতি নিরাপদ ও নির্জ্জন।" আমি কহিলাম—"আপনার গৃহে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে, আপনি এখানে বিশ্রাম করিবেন কি প্রকারে? আপনার গৃহে কি কেহ নাই?" আগন্তুক কহিলেন—

"দুইটি অনাথিনী স্ত্রীলোক আছেন।"

"তাঁহারা আপনার কে?"

"তাহারা আমার কন্যা, তাহাদের যে কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। গৃহ ছাড়িয়া পলাইবার কালীন তাহাদের বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাদের দেখিতে পাই নাই। আমি অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি—জীবনে অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমার সর্ব্বনাশ হইবে না ত কাহার হইবে? দস্যুহস্তে, আমার মৃত্যু হইলে আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইত। আমি পলাইলাম কেন?" এইরূপ কথোপকথনে সেই ভীমা রজনীর অবসান হইল। দেখিলাম, আমরা এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে বসিয়া আছি, তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষের সারি। সেই ভূমিখণ্ডের নিম্নে দুই

ধারে প্রশস্ত ময়দান—ময়দান প্রান্তে আবার ঐরূপ উচ্চ ভূমিখণ্ড, তাহার চারিদিকেও ঘন খর্জ্জুরের সারি। দেখিতে দেখিতে সেই অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষচূড় স্বর্ণ-কিরণ মণ্ডিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। তখন সেই স্বর্ণ-কিরণ মণ্ডিত অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে অসংখ্য বন্য-পক্ষী প্রভাত পবনে ডাকিয়া উঠিল। প্রভাত হইলে দেখিলাম—আমি যাঁহার নিকট বসিয়া আছি, তাঁহার বয়স হইয়াছে—বয়স প্রায় ষষ্ঠী বৎসর। কিন্তু শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সবল; খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কেশগুলি অধিকাংশই কাশকুসুমসঙ্কাশ। আমি তাঁহাকে কহিলাম,—"প্রভাত হইয়াছে, গ্রাম মধ্যে গিয়া আপনার কন্যাদ্বয়ের সন্ধান করা কর্ত্তব্য।" তিনি স্বীকৃত হইলেন। আমরা গ্রামাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে রামকুমার বাবু আমার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাঁর নাম রামকুমার দত্ত। আমি আমার নাম ও নিবাস তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বিস্ময়ের ন্যায় আমার মুখের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন—"আপনিই কি দেব-পুরের বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়? আপনি কি স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র?" আমি বিস্মিত হই-লাম, কহিলাম—"মহাশয় আমাকে কিরূপে জানিলেন?"

"সে এক্ষণকার কথা নহে।" তাহার পর কহিলেন—"আমি দেবপুরে, স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোর সংসারে বহু দিবস ছিলাম। আপনাকে আমি নিতান্ত শিশু দেখিয়াছিলাম।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, বিশ্বনাথ বাবুর সংসারে বহু দিবস ছিলেন, বলিতে পারেন, কে, তাঁহাদের এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে?" রামকুমার বাবু কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "উক্ত বিষয়ে বহুবিধ প্রবাদ আছে; কিন্তু হরিহর ঘোষালই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

"এই প্রবাদ কি সত্য?"

"আমরা বহুদিবসের লোক। আমরা বিশেষ জানি এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য।" এই কথার পর তিনি আর কিছুই বলিলেন না—দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিলেন। ক্রমে গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর উভয়ে এক বৃহৎ আম্রকানন মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলাম। দ্বিপ্রহরেও তাহার ভিতর অন্ধকার। সেই প্রায়ান্ধকার আম্রকানন মধ্যে এক বৃহৎ পুষ্করিণী; তাহার ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটের উপর এক স্ত্রীমূর্ত্তি। নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম, দেখিলাম—সেই স্ত্রীমূর্ত্তি—কুসুমিকা। রামকুমার

বাবু কহিলেন, "জগদীশ্বরের কৃপায় আমার একটি কন্যার সন্ধান পাইলাম।" পরে, কুসুমিকাকে, তাঁহার অপর এক কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুসুমিকা, তাঁহার কন্যার কথা কিছুই বলিতে পারিল না। রামকুমার বাবু তাঁহার কন্যার জন্য বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, কুসুমিকার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া, আমাকে কহিলেন, "আপনি ইহাঁকে এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এক্ষণে আপনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত এই খানে অপেক্ষা করুন, আমি একবার গৃহ হইতে আসি।" আমি কহিলাম, "আপনার গৃহ এখান হইতে কত দূর?" তিনি বলিলেন, "অতি নিকট।" তাহার পর, তিনি সেই আম্রকানন ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সেই প্রায়ান্ধকার আম্রকানন মধ্যে কুসুমিকা ও আমি। কুসুম আমাকে একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। তাহার ক্ষুদ্র বদন মণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুসুম কাঁদিতেছ কেন? আমাকে দেখিয়া কি দুঃখিত হইয়াছ?"

"তোমাকে দেখিয়া দুঃখিত হইব কেন? দিদির জন্য আমার প্রাণ কেমন করিতেছে—তাঁহার যে কি হইল!"

"দিদি, কে ?"

"যাঁহার গৃহে ছিলাম—তাঁহারই কন্যা।" এই কথার পর, কুসুম নীলাঞ্জিকার কথা জিজ্ঞাসা করিল, বলিল—"নীলাঞ্জিকা কেমন আছে ?" আমি বিরক্ত হইলাম। বলিলাম—'জানি না, বোধ হয় ভাল আছে।'

"তুমি কি তাহাকে ভাল বাসিবে না ?"

"কেন, আমি কি তাহাকে ভাল বাসি না ? তবে তুমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছ সে ভালবাসা, বসন্তকুমার, জীবনে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও দেয় নাই, দিবে না। কিন্তু তুমি তাহা গ্রহণ করিতে চাহ না—বলিতে পারি না, আমার ভালবাসা তোমার গ্রহণ যোগ্য কি, না।"

কুসুম, আমার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল; "আমার অদৃষ্ট গুণে তোমার ভালবাসা পাইয়াছি ; আর, তোমাকে আমি ভালবাসি কি না কি প্রকারে বুঝাইব ! বিধাতা আমার জিহ্বায় বল দেন নাই।" আমি কহিলাম, "কুসুম ! জিহ্বার বলে ভালবাসা বুঝান যায় না। তুমি আমাকে ভাল বাসিলে আমাকে ত্যাগ করিবে কেন ?"

"আমি ত তোমাকে ত্যাগ করি নাই—নীলাব্জিকার সহিত তোমার বিবাহ হইলে, আমি গিয়া তোমার চরণ সেবা করিতাম। আমি তোমাকে না দেখিয়া কয়দিন বাঁচিতে পারিতাম।" আমি কহিলাম, "কুসুম! তোমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় এত কোমল ও এত সুন্দর তাহা আমি জানিতাম না। পরের সুখের জন্য তোমাকে এত দূর ত্যাগস্বীকার কে শিখাইল? কিন্তু আজিও তোমার বালিকা বুদ্ধি ঘুচে নাই—তাহা না হইলে, তুমি আমার চক্ষের অন্তরাল হইলে আমি নীলাব্জিকার হইব, তুমি এরূপ বুঝিবে কেন? যাহা হউক, যদি আজিও এ চিন্তা তোমার মনমধ্যে থাকে, পরিত্যাগ কর।" এইরূপ কথা প্রসঙ্গে প্রায় দুই ঘন্টা অতীত হইল। রামকুমার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম, তাঁহার কন্যার কোন সন্ধান পান নাই। বিমর্ষভাবে আমাকে কহিলেন—"আপনি কুসুমিকাকে লইয়া দেবপুর যাত্রা করুন। এখান হইতে গঙ্গা অধিক দূর নহে, সেই খানে নৌকা করিয়া দিব, নৌকাযানে দেবপুর পৌঁছিতে প্রায় দুই দিবস লাগিবে। আপনি এখানে উপস্থিত না হইলে, আমি স্বয়ংই ইহাঁকে আপনার নিকট রাখিয়া আসিতাম।" তাহার পর আমরা রামকুমার বাবুর কথামত গঙ্গাভি-

মুখে যাত্রা করিলাম। গমন কালীন তাঁহাকে কহিলাম, “মহাশয়! কুসুমিকা কি প্রকারে আপনার আশ্রয়ে আসিল, জানিতে বড়ই ব্যগ্র হইয়াছি।” তিনি কহিলেন,—“ইতিমধ্যে আমি কোন প্রয়োজন বশতঃ দেবপুর গিয়াছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালীন একদা রজনীযোগে, জাহ্নবী তীরে দেবপুরের ঘাটে, কুসুমিকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অনাথিনী, নিঃসহায়া অথচ ভদ্রবংশসম্ভূতা বালিকা দেখিয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তাহাতে শুনি, যে ইনি মৃত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা এক্ষণে মাতৃহীনা, নিঃসহায়া। শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, কহিলাম, “মা! তোমার পিতার অন্নে আমি পালিত; যদি ইচ্ছা কর আমার গৃহে চল, আমার কন্যার ন্যায় থাকিবে। আমার গৃহেও আর কেহ নাই—একমাত্র বিধবা কন্যা আছে; তোমাকে আমি কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিব—আমার সহিত চল—কোন রূপ আশঙ্কা করিও না। তাহার পর, ইনি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইলে, ইহাঁকে গৃহে লইয়া আসি। তাহার পর আমার কন্যার প্রমুখাৎ ইহাঁর এখানে আসিবার কারণ অবগত হইয়াছি। এইরূপ কথা প্রসঙ্গে আমরা জাহ্নবীতীরে

আসিয়া উপনীত হইলাম। কুসুমিকা, রামকুমার বাবুর কন্যার নিমিত্ত কাঁদিতে লাগিল। রামকুমার বাবু তাহাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "এ সকল বিধাতার ইচ্ছা—বিধাতারই বা দোষ কি? এ সকল আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—আমার কর্ম্ম ফল।" তাহার পর, তিনি আমাদিগের জন্য এক-খানি নৌকা স্থির করিয়া দিলেন। নৌকায় উঠিবার সময়, আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এক খানি এক শত টাকার নোট দিলাম। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না—কহিলেন, "আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন না—আমি অতি পাপিষ্ঠ ও নরা-ধম, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" পরে ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "মহাশয় আমার যে নাম শুনিয়াছেন, উহা প্রকৃত নহে—উহা আমার কল্পিত নাম মাত্র। এক্ষণে মিথ্যা কহিয়া আর পাপের বোঝা ভারি করিব না। আমার নাম—হরিহর ঘোষাল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। হরিহর আর সেখানে দাঁড়া-ইল না।

আজি কয়েক দিবস হইল দেবপুরের বাটীতে আসি-য়াছি। তোমার আসিবার কথা ছিল, আসিলে না

কেন? এখানকার সংবাদ শুভ। তোমার কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে।ইতি—

তাং ১৫ই অগ্রহায়ণ } তোমারই স্নেহাকাঙ্ক্ষী
১২৭০ সাল। } বসন্ত কুমার।

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র।

বসন্ত কুমার!

তোমার পত্র পাইয়া আমার চমক হইল। তোমার পত্রের শেষাংশ পাঠে স্মরণ হইল, যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। অঙ্গীকার ভঙ্গ জন্য বোধ হয় আমি,বিশেষ দুঃখিত না হইয়া থাকিব। কিন্তু, তোমার দুর্দ্দিনে তোমার নিকট থাকিতে পারিলাম না ইহাই পরিতাপের বিষয়। কয়েক দিবস অতীত হইল, আমি একরূপ সংসার চিন্তায় উদাসীন ছিলাম। আমার এই ঔদাসীন্য কোথা হইতে আসিয়াছিল শুন। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে পত্র লিখি, তাহার প্রায় দুই তিন দিবস পরে একদা রজনী-যোগে হেম বাবুর বহির্গৃহে বসিয়া আছি। রাত্রি

জ্যোৎস্নাময়ী। হেম বাবুর বহির্গৃহের কক্ষবাতায়ন মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষ-সজ্জায় পড়িয়াছে। আমি এক খানি চেয়ারে বসিয়া আছি। আমার সম্মুখে এক বৃহৎ টেবিল, তদুপরি এক করোটী* ও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুস্তক। হেম বাবু একটি ক্ষুদ্র ডাক্তার। রাত্রি অনেক, গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল মাত্র নৈশপবন কম্পিত বৃক্ষ পত্রের ঝর্ ঝর্ শব্দ ও আঁধার বিহারী পেচকের কঠোর কণ্ঠ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইতেছে না। সম্মুখে বিকট করোটী চন্দ্রালোক বিভাসিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ভয়ানকে মধুর মিলন! ভয়ানক করোটী, মধুর কৌমুদী। যখন ভীমকান্ত, বর্ষণোন্মুখ, দিগন্তব্যাপী জলদ কোলে মোহিনী বিজলী খেলে, তখন ভয়ানকে মধুর মিলন হইয়া থাকে—নিবিড় জলদ-মালার ভীমকান্ত শোভা, মোহিনী বিজলীর মধুর বিকাশ। যখন ভীম শ্মশান ক্ষেত্রে, স্বর্গভ্রষ্ট কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্ত নারী প্রতিমা দাহার্থে বিসর্জ্জিত হয়, তখন ভয়ানকে মধুর মিলন হইয়া থাকে—ভয়ানক শ্মশান, তাহাতে বিদ্যুৎপ্রতিম রমণী দেহের ভৎকাল-

---

* Skull.

স্থায়ী মধুর সুষমা। যখন দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগে, ত্রিপুরারী দেবাদিদেব মহাদেব ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বিদ্যুৎপ্রতিম সতীশবস্কন্ধে, কক্ষভ্রষ্ট মহাগ্রহের ন্যায় চরাচর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন ভয়ানকে মধুরে মিশিয়াছিল!—হরের ব্যোমস্পর্শী কম্পিত জটাসমন্বিত ভুজঙ্গশ্রেণী বিজড়িত সংহারত্রিশূল-ধারী উদ্বেলিতপ্রলয়পয়োধিরূপি ভয়ানক রুদ্রমূর্ত্তি; আর অভিমানিনী আকুলায়িত কুন্তলা সতীর অতসী-কুসুমবর্ণাভা, বাসন্তীপবনমাধুরী-বিজড়িত, জ্যোৎস্না-লোকগঠিতা, ভীম রুদ্রস্কন্ধ-শায়িনী দেহলতার মধুর সুষমা! যাহা হউক, সেই চন্দ্রালোকমণ্ডিত বিকট করোটীর প্রতি দেখিতে দেখিতে প্রাণ উদাস হইয়া উঠিল। রজনী গভীরা, শব্দশূন্যা, চন্দ্রালোকে শুক্লাম্বরা; সম্মুখে এত সাধের মানুষ-প্রতিমার দুখময় অবশেষ! আঁধার দেবমন্দির! দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে! দেব অন্তর্হিত হইয়াছেন—শূন্য আঁধার মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে! এই দেবশূন্য দেবমন্দির প্রতি দেখিতে দেখিতে প্রাণ হু—হু করিয়া উঠিল। কি এক অপূর্ব্বভাব আসিয়া সংসারের সহিত মনের যে বন্ধন ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া—মনকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া কোথায় লইয়া চলিল।

সংসার প্রতি চাহিলাম, চন্দ্রালোক প্রতি চাহিলাম—মধুর প্রফুল্ল কৌমুদী—অসার, ক্ষীণপ্রভ বোধ হইল; চন্দ্রালোকের মাধুর্য্য হৃদয় মধ্যে অনুভূত হইল না। নৈশপবনে বৈরাগ্য গীত হইল। তখন সেই বিকট করোটীকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে সুবর্ণ মন্দির! তোমার ভিতর যে দেব এত দিন বিরাজ করিয়াছিলেন তিনি কোথায়?" সহসা যেন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম বিকট করোটী কঠোর স্বরে বলিতেছে, "আর কোথায়! যেখানে সকলই গিয়াছে ও যাইবে।"

আ। সে কোথায়?

ক। যাহাকে, তোমরা "অনন্ত" বল।

আ। সে, কি? সে কোথায়?

ক। যেখানে, আমি যাইব।

আমি বলিলাম, "তুমি আবার কোথায় যাইবে? তুমি ত চূর্ণীকৃত হইলে ধূলিগুঁড়া হইবে অর্থাৎ যে যে ভৌতিক পদার্থের সমষ্টিতে তুমি গঠিত সেই সেই পদার্থে তোমার মহাবিলয় ঘটিবে।" করোটী কহিল, "আমার অভ্যন্তরস্থ মহাজীবও যে যে ভৌতিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত সেই সেই পদার্থে বিলীন হইয়াছেন, তিনিও মাটিতে মিশাইয়াছেন আমিও মাটিতে মিশাইব।

তোমার ঐ স্বর্ণ মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মহাজীবও এইরূপ এক দিন মাটিতে মিশাইবেন।” আমি চমকিত হইলাম; কহিলাম, “আমাদিগের এই দেহ ত ভৌতিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত; আত্মাও কি তাহাই?” করোটী কহিল, “আত্মা কি তাহা জান? শরীর যন্ত্রের গতি মাত্র। শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণুই আত্মা—সুতরাং আত্মা ভৌতিক পদার্থের সমবায়ের ফল। পরমাণুই দেহ, পরমাণুই আত্মা, পরমাণুই ঈশ্বর। অন্য ঈশ্বর, অন্য আত্মা কল্পনাজগতের কথা মাত্র।” আমি নিস্তব্ধ হইলাম। হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশে যে একটি দীপ জ্বলিতেছিল, যে দীপের সান্ত্বনারূপ স্বর্ণকিরণ মৃত্যুর অন্ধকারময়ী বিকট ছায়াকেও যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলে; যে দীপ মরণোন্মুখের তমসাচ্ছন্ন শূন্যপ্রান্তরসম হৃদয়ে, আশা, ভরসা ও সান্ত্বনার মোহিনী কিরণ ঢালিয়া, সেই ভীমান্ধকারের উপর কি যেন কি এক অপূর্ব্ব আলোক আনিয়া ফেলে—সেই শূন্য প্রান্তরে কি জানি কি আশার প্রসূন ফুটায়, আজি নিশীথে করোটীকণ্ঠনিঃসৃত মহাবাক্য শুনিয়া সহসা সেই প্রখর দীপালোক মলিন হইয়া গেল। দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। পরে সন্দেহজনিত এক খানা কাল মেঘ আসিয়া হৃদয় আঁধার করিয়া তুলিল।

তখন সেই জ্যোৎস্নাজলধৌতা শব্দশূন্যা রজনী গভীরা হইলে গৃহে ফিরিলাম। তাহার পর কয়েক দিবস এই ভাবে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে এক দিবস হেম বাবুর বাগানে বসিয়া আছি, সন্ধ্যা হইল। সান্ধ্যগগনের নীলিমা দেখিলাম। মস্তকোপরি, নীল সাগরে চাঁদ ভাসিল; জ্যোৎস্না ফুটিল; সেই জ্যোৎস্না বৃক্ষের শ্যামল পত্ররাজি বিধৌত করিয়া কানন মধ্যে ফুটিল; কাননভূষণ অযুত কুসুম জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া নৈশপবনে দুলিতে লাগিল। আমি উদাস চিত্তে এই সকল দেখিতে লাগিলাম। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ জ্যোৎস্নাজলধৌতা; নিম্নে সমস্ত প্রকৃতি চন্দ্রকরোজ্জ্বল! ভাবিলাম, এই যে মধুময় ক্রীড়াশীল জড়জগৎ, ইহা কাহার খেলা? কত দিন হইতে ইহারা এই মধুময় খেলা খেলিতেছে? কত দিন সূর্য্য? কত দিন আঁধারে আলোক ফুটিয়াছে? কত দিন চাঁদ? কত দিন জ্যোৎস্না? কত দিন বায়ু? কত দিন ফুল? ঊর্দ্ধে, অম্বর পথে এই যে কোটী কোটী পৃথিবী, ইহারাই বা কত দিন? বিবিধ রত্নপূর্ণ অনন্তসৌন্দর্য্যভাণ্ডার এই যে মাটির বিশ্ব, ইহাতে এই যে অনন্ত কোটী জীব, তন্মধ্যে এই যে সুন্দর নরনারী প্রতিমা, ইহারাই বা কত দিন? কে বলিবে কত দিন!

জাল, ইহারা কোথা হইতে আসিল? পরমাণু কোথা হইতে আসিল? বসন্তকুমার! এই জগৎশরীরে কি কোন আত্মা নাই? শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণু ব্যতীত, শরীর যন্ত্রের গতি ব্যতীত, কি আত্মা স্বতন্ত্র নহে? আত্মা কি? উহা কি? তাহা জানি না—বুঝাইতে পারি না। তর্ক সহায়ে আত্মার অস্তিত্ব বুঝাইতে পারি না; আত্মা কি তর্কে ঈশ্বরঅস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তর্ক ছাড়িয়া দাও। মাটির পুতুল! আমাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা আছে; সেই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা অপরিসীম, অনন্ত সুতরাং অজ্ঞেয় তাহা কি প্রকারে বুঝিব! বুঝিতে না পারিয়া তাহা স্বীকার করিব না এ মত অতি অসার। ভাই হে! করোটী বাক্যে আমার হৃদয় মরুভূমি হইয়াছিল—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইতে ছিলাম। যে হৃদয়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাস তাহা মরুভূমি নহে ত কি? দেখ, এই অনন্ত ক্রীড়াশীল, অসংখ্য রত্নরাজিময় সংসার, যে সংসারে অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে সংসারে পথিস্থ এক গাছি তৃণ ও ক্ষুদ্র এক নীহার বিন্দুর গুণ, বুধমণ্ডলী সমস্ত জীবনে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—এই যে বিস্ময়াধার পৃথিবী;—

ঊর্দ্ধে, এই যে অনন্ত নীলাকাশ—উহাতে আবার এই যে কোটী কোটী পৃথিবী ছুটাছুটি করিতেছে, ইহা কি সকলই কেবল পরমাণুর খেলা? ইহার কি নিয়ন্তা কেহ নাই? সকলই কি কেবল অন্ধ নিয়মের কাজ? অসংখ্যনক্ষত্রখচিত নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত প্রকৃতির এই মহা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কোন মনুষ্যপতঙ্গ সেই সর্ব্ব-ময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবে? সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হউক, আমি ধর্ম্ম বিনাশক কঠোর করোটী চূর্ণীকৃত করি-য়াছি।

তোমারই স্নেহভিখারী
হরকুমার।

পুঃ—

হা কৃষ্ণ! মানুষ কি স্বার্থপর! আমি ত নিজ মনো-দুঃখ তোমাকে পঞ্চদশ পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদিগের সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম না। কি করিব ভাই, এই পাপ করোটী আমাকে সংসার-চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন রাখিয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ এবং সানন্দে, সজ্ঞানে তোমাকে

অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি যে তুমি তোমার চিরবাঞ্ছিত সরলা বালা কুসুমিকাকে বিবাহ করিতে কোন মতে কাল বিলম্ব করিবে না। ইতি——

তাং ২রা পৌষ
১২৭০ সাল। } হরকুমার শর্ম্মা।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র।

অভিন্নহৃদয় হরকুমার !

প্রায় দুই মাস হইল, আধ্যাত্মিক বাগ্‌বিতণ্ডাপূর্ণ তোমার এক খানি পত্র পাইয়াছি। তদুত্তরে লিখিতেছি যে তুমি, করোটী ও পঞ্চভূত ছাড়িয়া শীঘ্রই এ অধীনের আলয়ে দেখা দিবে। আমি ইতিমধ্যে বিবাহ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আগামী ১৯শে ফাল্গুন বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। তোমাদের ওখান হইতে দেবপুরে আসিতে প্রায় তিন দিবস লাগিবে। নাগাৎ ১২ই ফাল্গুন যেন কোন মতে তোমাদের যুগলরূপ দর্শনে বঞ্চিত না হই। আর অধিক কি লিখিব ! হাঁ—

আর এক কথা। গত মাঘ মাসে নীলাব্জিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নীলাব্জিকার স্বামী সুপাত্র, পশ্চিম প্রদেশে কোন হউসে কর্ম্ম করেন। তাঁহার নিবাস ভদ্রেশ্বর। বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়াই তিনি পশ্চিম যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম, দুই চারি মাস পরে তাঁহার বনিতাকে ভদ্রেশ্বরের বাটীতে লইয়া যাইবেন। এক্ষণে, নীলাব্জিকা তাহার পিতৃগৃহেই অবস্থান করিতেছে। আজি কালি তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাব নাই। আমি তাহার সম্বন্ধে বিস্তর আশঙ্কা করিয়াছিলাম। এক্ষণে নীলাব্জিকা পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর প্রফুল্ল, বিস্তর শান্ত। কুসুমিকা ও নীলাব্জিকা সর্ব্বদাই একত্রে থাকে। কুসুম গহনা পরিতে অঙ্গরাগ করিতে বড় নারাজ; নীলাব্জিকা তাহাকে ধরিয়া গহনা পরাইয়া দেয়, চুল বাঁধিয়া দেয়, কখন কখনও তাহার ক্ষুদ্র ললাটদেশে ছোট রকমের একটি টিপ কাটিয়া দেয়; উভয়ে উদ্যান মধ্যে একত্রে বেড়ায়, একত্রে ফুল তুলে। নীলাব্জিকার মালা গাঁথিবার বড় সাধ; হইল এক ছড়া মালা গাঁথিয়া কুসুমের খোঁপায় পরাইয়া দিল; কুসুম দুইটা ফুটন্ত গোলাব লইয়া নীলাব্জিকার কবরী ভূষিত করিল। বাল্যাবধিই ইহারা পরস্পরকে ভাল বাসে, তবে

আজি কালি ইহাদের প্রণয় স্রোত যেন অধিক বৰ্দ্ধিত। কুসুম হরিহর ঘোষালের গৃহ হইতে এখানে আসিয়াই শুনিল যে, নীলাব্জিকার বিবাহ। সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতেছ? ইহাতে কি তুমি সুখী হইবে?" এই কথা শুনিয়া নীলাব্জিকার চক্ষ জলভারস্তম্ভিত হইল, অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া কুসুমকে কহিল, "ভগ্নি! তোমার মুখ মনে করিয়া আমি পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইব।" কুসুম বলিল, "বিস্মৃত হইতে পারিবে? একবার ভাল বাসিলে কি কখন ভুলা যায়?" নীলাব্জিকা কহিল, "কুসুম, আমি আমার চিত্ত সংযত করিয়াছি, তুমি আমার জন্য দুঃখিত হইও না।" হরকুমার! এই সকল কথা আমি কুসুমিকার নিকট শুনিয়াছি। নীলাব্জিকার চিত্তসংযমে প্রয়াস প্রশংসনীয়। নীলাব্জিকা এক্ষণে আমাকে দেখিলেই অতি কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া যায়, যাহাতে সে আমার নয়ন পথে না পড়ে এরূপ যত্নও করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাকে। আবার কখন কখন আমার অজ্ঞাতসারে সজল নয়নে, দূর হইতে আমার প্রতি চাহিয়া থাকে—আবার আমার দৃষ্টিপথে পড়িলেই তৎক্ষণাৎ সলজ্জ ভাবে সে

স্থান ত্যাগ করিয়া যায়। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর এই বালিকাহৃদয়ে চিত্তসংযমোপযোগী বল প্রদান করুন।

দেবপুর।
তাং ৫ই ফাল্গুন
১২৭০ সাল।

তোমারই
বসন্ত।

হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র

ভাই হে! নৌকাযানে জাহ্নবীজলকল্লোল শুনিতে শুনিতে গৃহে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাটী আসিয়া অবধি প্রত্যহই গৃহিণী প্রমদার মুখে তোমাদের কথা শুনিয়া থাকি। প্রমদা তোমার নববিবাহিতা পত্নীর সরল প্রকৃতির বড়ই প্রশংসা করে। সর্ব্বাপেক্ষা সে তোমার ভগ্নী ভুবনমোহিনীর সৌজন্যে একান্ত মুগ্ধা। আর প্রমদার মুখে নীলাব্জিকার কথাও শুনিলাম। তুমি লিখিয়াছিলে, নীলাব্জিকা পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর প্রফুল্ল। উহা তোমার ভ্রম। নীলাব্জিকা এক্ষণে মেঘময় প্রভাতের মলিন পদ্ম—ফুটিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না—প্রফুল্ল হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। নীলাব্জিকা কি হাসে না? হাসে, কিন্তু তাহা বিদ্যুৎপ্রতিম—দেখিতে না দেখিতেই অধরপ্রান্তে মিলাইয়া যায়।

প্রমদার মুখে শুনিলাম, তোমার বিবাহদিনে অন্তঃপুরস্থ নারীসকলে মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে—সকলেই তোমার বিবাহ উপলক্ষে ব্যস্ত—কেহ বিবাহের মাঙ্গলিক কর্ম্মে ব্যস্ত, কেহ আমোদে ব্যস্ত, কেহ বা অলঙ্কার লইয়াই ব্যস্ত। নীলাব্জিকা কি ব্যস্ত ছিল না? নীলাব্জিকা আপন হৃদয়সংগ্রাম লইয়া ব্যস্ত ছিল। তোমার বিবাহদিনে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা কে বুঝিবে! সমবেত নারীমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া কতবার তাহার বৃহৎ চক্ষু দুইটি জলে পুরিয়া গিয়াছে,কত কষ্টে সে তখন সেই চক্ষের জল সম্বরণ করিয়াছে, তাহা কে বুঝিবে! কাঁদিবার জন্য প্রাণ বাহির হইতেছে অথচ কাঁদিতে পারিতেছে না, ইহা কি সামান্য ক্লেশ! চিত্তসংযম কঠোর ব্রত—স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে হইবে। নীলাব্জিকা প্রতিকূলে বাহিতেই চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। সে এক্ষণে চাহিতেছে কি, "বিস্মৃতি" কিন্তু স্মৃতি যে ইচ্ছাধীন নহে। দূরহউক তোমাকে আর এ সকল কথা লিখিয়া উদ্বিগ্ন করিব না। তোমাদিগের কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। আমরা ভাল আছি।

২রা চৈত্র
১২৭০ সাল। } হরকুমার শর্ম্মা।

কুসুমিকার প্রতি নীলাব্জিকার পত্র।

প্রিয় কুসুম!

প্রায় দুই বৎসর হইল স্বামীগৃহে আসিয়াছি। প্রথম প্রথম তোমার কয়েক খানি পত্র পাইয়াছিলাম। আজি কালি তোমার পত্র পাই না কেন? বুধবারে তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি—কিন্তু উহা আজি ছয়-মাসের পর। তুমি লিখিয়াছ, আমি এখানে আসিয়া তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি। এ রহস্য কেন? ভগ্নি! তোমাদিগকে আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এই দুই বৎসর কাল তোমাদিগকে দেখি নাই সত্য, কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে কবে তোমাদের বিষয় না ভাবিয়াছি? এমতও হইয়াছে যে স্বামীর সহিত কথোপকথন কালে তোমাদের কথা মনে হইয়া এতদূর অন্যমনা হইয়াছি যে তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারি নাই; ইহার নিমিত্ত কতবার তাঁহার নিকট তিরস্কৃতাও হইয়াছি। ভদ্রেশ্বরে আসিয়া প্রথম বৎসর একরূপ কাটিয়াছিল। গৃহধর্ম্মে মন বসিতেছিল—অনেকটা ভাল ছিলাম। আজি কালি যে আমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। কিছুতেই মন নাই, কিছুই ভাল লাগে না—

কেবল দেবপুরের গৃহ মনে পড়ে ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কতকথা মনে পড়ে। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। আর যে তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এমত ভরসা করি না। পিতা যদি গৃহে থাকিতেন তাহা হইলেও বা এক সময় দেবপুর যাইবার আশা থাকিত। তিনি ত কাশীবাসী। বহুদিবস হইল তাঁহারও কোন সংবাদ পাই নাই।

যাহা হউক তোমার প্রিয় স্বামীকে ও ঠাঁকুরঝিকে আমার প্রণাম জানাইও। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন ত বলিও—নীলাব্জিকা ভাল আছে। আমার মাথার দিব্য এ লিপি তোমার স্বামীকে দেখাইও না। আর এক কথা—তোমার সেই চন্দ্রমল্লিকার গাছগুলি কেমন আছে? আমি যে মাধবীলতাটী তোমাদের উদ্যানে স্বহস্তে পুঁতিয়া আসিয়াছিলাম সেটিকত বড় হইয়াছে? তাহাতে ফুল ফুটিতেছে কি না, লিখিবে। আমাদের এখানেও অনেকগুলি ফুলের গাছ আছে, কিন্তু ইহাদের প্রতি আমার মায়া নাই—কেন, বলিতে পারি না। আজি এই পর্য্যন্ত, তোমার পত্র আসিলে আর আর কথা লিখিব।

৮ই বৈশাখ ১২৭৩ সাল। ভদ্রেশ্বর।	তোমারই— সেই নীলাব্জিকা।

নীলাঞ্জিকার প্রতি কুসুমিকার পত্র।

দিদি!

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যাহা নিষেধ করিয়াছিলে তাহাই হইয়াছে। তিনি তোমার পত্র দেখিয়াছেন। কালি বৈকালে শয়নকক্ষে বসিয়া তোমার পত্র পড়িতেছি, স্বামী আসিলেন। আমার কেমন হইল পত্রখানি লুকাইতে পারিলাম না। স্বামী আজি কালি তোমার সংবাদ জানিবার জন্য বড় ব্যস্ত। তিনি তোমার পত্র দেখিয়া আগ্রহসহকারে পড়িতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম পড়িতে পড়িতে তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। দিদি! তুমি মনে করিও না যে আমার স্বামী তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন; তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, আজিও সেইরূপ।

তোমার মনের অসুখ শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তুমি লিখিয়াছ, তুমি আমার জন্য সর্ব্বদা ভাবিয়া থাক; আমি কি তোমার জন্য ভাবি না? তুমি লিখিয়াছ যে আর আমাদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ

হইবে না। সত্যই কি আর তোমাকে দেখিতে পাইব না? ভাল, বালিকাবয়স এত শীঘ্র ফুরায় কেন? আমার ইচ্ছা আবার বালিকাবয়স ফিরিয়া আসে—আবার তোমাতে আমাতে সেইরূপ হাল্‌কা মনে একত্রে বেড়াই! আমার বোধ হয় যতই আমাদিগের বয়স বাড়িতে থাকে ততই যেন আমাদিগের মন কি জানি কেমন একরূপ ভারি হইয়া উঠে; লোকে এত ভারি মন লইয়া কি করিয়া থাকে! সে যাহা হউক তুমি আমার সেই চন্দ্রমল্লিকাগাছ-গুলির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; সেগুলি বেশ বড় বড় হইয়াছে; তাহাতে অনেক ফুল ফুটিতেছে। তোমার মাধবীলতাটী অনেক দিন হইল শুকাইয়া গিয়াছে। আমি অনেক যত্ন করিয়াছিলাম। বাঁচিল না। আর কি লিখিব! আমার প্রিয়স্বামীর ও ঠাকুরঝির আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি——

তাং ১২ই বৈশাখ
১২৭৩সাল। } কুসুমিকা।

বসন্তকুমারের প্রতি নীলাব্জিকার পত্র।

বসন্তকুমার!

আমি পাপিষ্ঠা—পাপিষ্ঠা না হইলে আজি তোমাকে এই পত্র লিখিতে বসিলাম কেন? পাপিষ্ঠা না হইলে আজিও তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না কেন? চিত্ত সংযত করিতে যত্ন করি নাই এমত নহে, তথাপি আমার চিত্ত বশীভূত হইল না কেন? তুমি আমাকে ভালবাস না জানিয়াও তোমাকে ভুলিতে পারি না কেন? তুমি মনে করিও না যে আমার চিত্ত দমনে ইচ্ছা ছিল না—চিত্ত দমনে ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ করিব কেন? যে দিন জানিতে পারিয়াছিলাম আমার জন্য তোমার হৃদয়ে এতটুকুও স্থান নাই, সেই দিনই বিষ খাইয়া মরিতাম; কিন্তু তখন মনে করিলাম যদি বিধাতার এইরূপই ইচ্ছা তবে বিষ খাইয়া মরি কেন— আমি চিত্ত সংযত করিব। কিন্তু এখন ভাবি, তখন বিষ খাই নাই কেন! যিনি আমাকে ভাল বাসেন—যাঁহাকে ভালবাসা আমার ধর্ম্ম তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না—স্বামীচরণে মন রাখিতে পারিলাম না, কেন?

নন্দনকানন থাকিতে পদ্ম পৃথিবীর পঙ্কে ফুটে কেন? ললাটলিখন! পূর্ব্বে চিত্তদমনে ইচ্ছা ছিল এখন আর সে ইচ্ছাও নাই। পূর্ব্বে তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিতাম, এক্ষণে ইচ্ছা করিয়া তোমার চিন্তা করি। এ জগতে তোমার চিন্তা ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই—অন্য কোন আশা নাই—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। সকল আশা সকল আকাঙ্ক্ষা এ জন্মের মত ফুরাইয়াছে। বসন্তকুমার! আজি কয়েকমাস হইতে আমি উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছি। আমার এই পীড়া স্থায়ী নহে—কখন আসে, কখন যায়। আজি প্রায় দুই মাস হইল স্বামী পাশ্চাত্য—কর্ম্মস্থলে গিয়াছেন। আমার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা হইতেছে কিন্তু পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন রোগাক্রান্তা হই তখন কেমন্ থাকি জানি না; আর যখন ভাল থাকি, তখনই কি ভাল থাকি?—প্রাণের ভিতর ধূ, ধূ করে; সহসা কে যেন আসিয়া নিশ্বাসের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়—একটা নিশ্বাস একবার, দুইবার, তিনবারে টানিতে হয়। গৃহে মন তিষ্ঠে না—গৃহ যেন শ্মশান বলিয়া বোধ হয়। আমার প্রাণ যে কেমন করে তাহা কেবল আমিই

জানি। নির্দ্দয়! কোন পাপে আমি এই নরকানল দিবা-নিশি বুকে করিয়া বহন করিতেছি? কোন পাপে আমার অন্তর বাহির শূন্য হইয়া গিয়াছে? ভাল বাসিয়া? ভালবাসা কি পাপ? প্রণয় কি দোষাবহ? আমার এই প্রণয় কি দোষাবহ? বসন্তকুমার! আমার প্রণয় দোষাবহই হউক আর যাহাই হউক— আমি পাপিষ্ঠাই হই আর যাহাই হই, তুমি ইহা নিশ্চিত জানিও যে এই পাপিষ্ঠা অপেক্ষা এ পৃথিবীতে তোমাকে আর কেহই অধিক ভাল বাসিবে না। আমার ইহ জন্মের সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা ফুরাইয়াছে। কেবল এক আকাঙ্ক্ষা আজিও আছে—মরিবার সময় তোমার মুখ দেখিয়া মরিব। কিন্তু তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? বুঝি জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে সে সুখও লিখেন নাই! ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন! আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না।

১৭ই ফাল্গুন
১২৭৩ সাল।

মন্দভাগিনী
নীলাব্জিকা।

নীলাজ্জিকার প্রতি বসন্তকুমারের পত্র।

নীলাজ্জিকা! তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যেন তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ কর! আমি তোমার কোন কথারই প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। সংসারের মনঃপীড়াই বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছা! যাহা হউক তুমি মনে করিও না যে তোমার প্রতি আমার স্নেহ নাই—তোমার প্রতি আমার স্নেহ বরাবর ছিল, আজিও আছে, চিরকাল থাকিবেও। তবে এইমাত্র জানিও যে স্নেহ এক, ভালবাসা আর।

২০শে ফাল্গুন
১২৭৩সাল। } বসন্তকুমার।

হরকুমারের প্রতি বসন্তকুমারের পত্র।

হরকুমার!

চারি মাস পূর্ব্বে নীলাঞ্জিকার এক খানি পত্র পাইয়াছিলাম। তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা লিখি তাহাও তোমাকে জানাইয়াছি। এই কয়েক মাসের মধ্যে তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। আমিও তাহাকে আর কোন পত্র লিখিতে সাহস করি নাই। আজি সপ্তাহ কাল হইল এক দিন রাত্রিশেষে চিন্তাপীড়িত হৃদয়ে জাহ্নবী-তীরে বেড়াইতেছিলাম। চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়াছে। এখনও রাত্রি রহিয়াছে। প্রাবৃট্‌কাল। মেঘ আসিয়া সমস্ত আকাশ ঢাকিয়াছে। ঊর্দ্ধে ঘনান্ধকার; ভাগীরথী-তীরে সেই অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়াছে। বিশালভাগীরথীহৃদয় সেই অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ভাগীরথীতীরে যে স্থানে আমি বেড়াইতেছিলাম তাহার অদূরে এক অতি বিস্তৃত শ্মশানভূমি। সেই শ্মশান ভূমিতে তখন কাহার শবদাহ হইতেছিল। তাহার চিতাপ্রজ্বলিত আলোকে অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশান-ভূমি অধিকতর ভীষণ দেখাইতেছিল। প্রকৃতি নীরব—

বায়ু পর্য্যন্ত বহিতেছে না, কেবলমাত্র শ্মশানভূমিস্থ শবভুক্ পশুগণের কর্কশ কণ্ঠের ক্বচিৎধ্বনি ও বিপুল-সলিলা ভাগীরথীর কল কল রব। সহসা সেই নীরব, অন্ধকারময় ভাগীরথীতীরে মধুর রমণীকণ্ঠে কে গাইয়া উঠিল;——

"পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে।
পরিহরি গেলা পিয়া কোন অপরাধে॥"

যে গাহিতেছিল, সে এই পর্য্যন্ত গাহিয়াই থামিল। তাহার স্বর অতি কোমল ও মর্ম্মভেদী। কে গাহিতেছে দেখিবার জন্য সেই অন্ধকারময়ী নদীতীরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলাম। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ক্ষণপরে শ্মশানমধ্য হইতে আবার সেই কোমল মর্ম্ম-ভেদীস্বরে গীত হইল;——

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল—"

এবার স্বর শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। দ্রুতপদে শ্মশান মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই বিস্তৃত শ্মশান-ভূমি মধ্যে যে শবদাহ হইতেছিল তাহার চিতাপ্রজ্জ্বলিত আলোকে, শ্মশানপ্রান্তে, অস্পষ্টে এক স্ত্রীমূর্ত্তি লক্ষিত

হইল। তাহার নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম—বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দেখিলাম সেই স্ত্রীমূর্ত্তি—নীলাঞ্জিকা! তাহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় বায়ুবিতাড়িত মেঘখণ্ডের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহার সে রূপ নাই—পূর্ব্বের প্রফুল্লকমলতুল্য অনিন্দ্য-মোহিনী রূপরাশি বিকৃত হইয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ নিবিড়-কৃষ্ণকেশদাম এক্ষণে আলুলায়িত, রুক্ষ ও জটাযুক্ত। তাহার বসন গৈরিক ও অল্পায়ত। আমি নীলাঞ্জিকার সম্মুখীন হইলে সে বিস্ফারিতলোচনে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল—তাহার দৃষ্টি অর্থশূন্য। নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার ক্ষীণালোকে তাহাকে দেখিয়া শ্মশানবিহারিণী ভৈরবী বলিয়া বোধ হইল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলাম; নীলাঞ্জিকা মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল;—

সুনীল মেঘের কোলে কই সে আমার চাঁদের হাসি
সুঠাম শ্যামের বামে কই সে আমার রাই রূপসী!

তাহার পর সে মৃদু অথচ অস্পষ্টস্বরে কি বলিতে লাগিল। আমি কহিলাম, "নীলাঞ্জিকা! কি বলিতেছ—আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?" নীলাঞ্জিকা কিছুই

বলিল না। পরে সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। আমি দেখিলাম এক্ষণে ইহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। ভাবিতে লাগিলাম, কি উপায়ে ইহাকে গৃহে লইয়া যাই! নীলাঞ্জিকা আবার মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল ;—

গলে দোলে বনমালা
কাণে দোলে দুল,
যমুনা পুলিনে সই
মজিল দুকুল।

এই সময় সেই তমসাবৃত শ্মশানভূমে যে শবদাহ হইতেছিল তাহার চিতা নিবিল। অন্ধকার শ্মশানভূমি আরও অন্ধকার হইল। নীলাঞ্জিকা নির্ব্বাপিত চিতার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "দেখ—দেখ—সব পুড়ে গেল—মানুষ পুড়ে গেল—দেখ্‌বে এস—দেখ্‌বে এস"—ইহা বলিয়া যে স্থানে শবদাহ হইতেছিল সেই দিকে দৌড়াইল। তখন রাত্রি রহিয়াছে। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পূর্ণ। আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর;—মেঘ ডাকিল, বায়ু গর্জ্জিল তৎসহ শ্মশানভূমিস্থ শবভুক্ পশুগণের বিকট কণ্ঠ মিশিল। আমি স্বপ্নবিমূঢ়ের ন্যায়—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীলাঞ্জিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলাম।

কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঝড় বৃষ্টিতে বিশ্ব তোলপাড় করিতে লাগিল।

তাহার পর কয়েক দিবস ক্রমান্বয়ে নীলাজিকার অন্বেষণ করিলাম। কোথায়ও তাহার সন্ধান মিলিল না। চন্দ্রেশ্বরে তাহার অনেক খোঁজ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই শ্মশানবিহারিণী উন্মাদিনীর আর কোন সন্ধানই মিলিল না। ইতি——

তাং ৭ই শ্রাবণ
১২৭৪ সাল।
দেবপুর।

বসন্ত।

সমাপ্ত।